সুনীতি-বিকাশ।

দ্বিতীয় ভাগ।

(শিক্ষাবিভাগের মাননীয় ডিরেক্টর মহোদয়ের নির্দ্ধারিত
নিয়মানুসারে ষষ্ঠ মানের জন্য রচিত।)

'অঞ্জলি', 'ধ্যানলোক', 'প্রহ্লাদ-উপাখ্যান' প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা,
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহায়ক-সদস্য,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্যতম পরীক্ষক,

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত।

"সাধনাকুঞ্জ", ঘাটফরাদ বেগ, চট্টগ্রাম হইতে শ্রীস্বর্ণকুমার দত্ত
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সুনীতি-বিকাশ।

দ্বিতীয় ভাগ।

(শিক্ষাবিভাগের মাননীয় ডিরেক্টর মহোদয়ের নির্দ্ধারিত
নিয়মানুসারে ষষ্ঠ মানের জন্য রচিত।)

'অঞ্জলি', 'ধ্যানলোক', 'তপোবন', 'প্রহ্লাদ-উপাখ্যান' প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা,
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহায়ক-সদস্য,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা
সাহিত্যের অন্যতম পরীক্ষক,

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত।

"সাধনাকুঞ্জ", ঘাটফরাদ বেগ, চট্টগ্রাম হইতে শ্রীস্বর্ণকুমার দত্ত
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য পাঁচ আনা।

বিজ্ঞপ্তি।

"সুনীতি-বিকাশ" প্রথম ভাগ সম্বন্ধে যাহা নিবেদন করিয়াছি, তাহা সর্ব্বাংশে এই দ্বিতীয় ভাগ সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারে। সকল ধর্ম্ম ও তাহার শ্রেষ্ঠ নীতি আশ্রয় করিয়া শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের নির্দ্দেশানুসারে এ পুস্তকখানিও বিরচিত হইয়াছে। যাহাতে সকল ধর্ম্ম-সমাজের শিক্ষার্থী বালকগণ সম-ভাবে উপকৃত হয়, তদ্বিষয়ে পূর্ব্বের ন্যায় বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছি।

"সুনীতি-বিকাশের" দ্বিতীয় ভাগেও আমি বালকবালিকাদের জন্য প্রকাশিত সুপ্রতিষ্ঠিত মাসিক পত্র "মুকুল" হইতে "হেনরী ফসেট" ও "ধূলিকণা ও মেঘ" শীর্ষক দুইটী প্রবন্ধ সঙ্কলন করিয়াছি এবং অপর কয়েকখানি পুস্তকের অল্পাধিক সাহায্য লইয়াছি। এজন্য লেখক ও গ্রন্থকার মহোদয়গণের নিকটে কৃতজ্ঞ রহিলাম।

এতদ্ব্যতীত আমার পরমারাধ্য পিতৃদেবের অপ্রকাশিত কাব্য "বন-লতা" হইতে "ধর্ম্মার্থে নিহত ঈশা" নামক কবিতাটী এবং আমার কনিষ্ঠা সহোদরা শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্তের "শিশির" কাব্য হইতে "মাতৃ-স্নেহ" "নববর্ষ" ও "ঈশপ্রেম" নামক কবিতা তিনটী উদ্ধৃত করিয়াছি।

উল্লেখ বাহুল্য, আমার অভিন্নহৃদয় সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মিত্র বি, এল, মহাশয় "সুনীতি-বিকাশ" দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশেরও সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে একদিকে যেমন সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত করিয়াছেন, তেমনি অপর দিকে নানা ঝঞ্চাট হইতে মুক্তি দিয়াছেন। তাঁহার সহায়তা ব্যতীত আমি কখনও এত স্বল্পসময়ের মধ্যে এত সুচারুরূপে "সুনীতি-বিকাশ" প্রকাশ করিতে পারিতাম না।

পরিশেষে আশা করি, "সুনীতি-বিকাশ" প্রথম ভাগের ন্যায় দ্বিতীয় ভাগখানিও বালকদিগের জ্ঞানার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে সুনীতি-বিকাশের যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

বৈশাখী-পূর্ণিমা।
১৩২২
"সাধনা-কুঞ্জ", চট্টগ্রাম।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

সূচীপত্র।

গদ্যাংশ।

পদ্যাংশ।

সুনীতি-বিকাশ

দ্বিতীয় ভাগ।

(গদ্যাংশ।)

সম্রাট অশোক।

বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণের প্রায় দুই শত বৎসর পরে সম্রাট অশোক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ন্যায় ধর্ম্ম-প্রাণ ও একচ্ছত্র সম্রাট ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক-যুগে একান্ত দুর্ল্লভ। বুদ্ধদেব অসাধারণ আত্ম-ত্যাগ ও সাধনার বলে জগতে যে মহাধর্ম্মের বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন, সম্রাট অশোকের ঐকান্তিক যত্নে ও আগ্রহে তাহা মহামহীরুহে পরিণত ও ফলপুষ্পে পরিশোভিত হইয়াছিল।

রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের পিতামহ মহাবীর চন্দ্রগুপ্ত স্বীয় ক্ষমতা ও বুদ্ধি প্রভাবে প্রাচীন রাজবংশের উচ্ছেদ সাধনপূর্ব্বক মগধের রাজ-সিংহাসনে মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। অসামান্য তীক্ষ্ণধী চাণক্যপণ্ডিত তাঁহার প্রধান সহায় হইয়াছিলেন।

মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত লোকান্তরিত হইলে বিন্দুসার পিতৃ-পরিত্যক্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার অনেকগুলি মহিষী ছিলেন, তন্মধ্যে অশোকের জননী মহারাণী সুভদ্রাঙ্গী জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যা ছিলেন।

অশোকের আকৃতি তেমন সুন্দর ছিল না বলিয়া বাল্যকালে তাঁহার পিতা মহারাজ বিন্দুসার তাঁহাকে যথোচিত স্নেহ করিতেন না। কিন্তু তাঁহার অসাধারণ গুণে রাজসভাসদবর্গ ও প্রজাবৃন্দ সকলেই মুগ্ধ ছিলেন। অতি অল্প বয়সেই তিনি তক্ষশিলার বিদ্রোহ দমন করিয়া সবিশেষ খ্যাতি লাভ করেন এবং উজ্জয়িনীর শাসনকর্ত্তৃত্বপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন।

মহারাজ বিন্দুসার খৃষ্টপূর্ব্ব ২৬৮ অব্দে পরলোকযাত্রা করেন। তাঁহার দেহত্যাগের পর অশোক রাধাগুপ্ত ও খল্লাতক নামক দুইজন প্রধান মন্ত্রীর সহায়তায় বৈমাত্র-ভ্রাতৃগণের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া পিতৃ-সিংহাসন অধিকার করেন। ইহার চারিবৎসর পরে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্ব ২৬৪ অব্দে মহাসমারোহে তাঁহার অভিষেক কার্য্য সুসম্পন্ন হয়।

সম্রাট অশোক তাঁহার রাজ্যাভিষেকের আট কিংবা নয় বৎসর পরে সুবিস্তৃত কলিঙ্গ রাজ্য জয় করেন। এই মহাযুদ্ধে বহুলক্ষ লোক হত, আহত ও বন্দী হয়। সমরক্ষেত্রের ভীষণ দৃশ্যে উদারহৃদয় অশোকের প্রাণে মহাবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, বাহুবলে পৃথিবী জয় করা অপেক্ষা ধর্ম্মবলে গরীয়ান্ হইয়া শান্তি ও মৈত্রীর বার্ত্তা ঘোষণা করাই উচ্চতর কার্য্য।

এই ঘটনার অল্পকাল পরেই উদার-চেতা অশোক ভগবান বুদ্ধদেবের প্রচারিত "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" মূলক বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং যে মহাধর্ম্মের শরণ লইয়া আত্মজীবনে শান্তি ও সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইলেন, তাহা ত্রিতাপ-দগ্ধ

জগতের প্রত্যেক মুমুক্ষু নরনারীর নিকটে উপস্থিত করিতে কৃতসংকল্প হয়েন।

সম্রাট অশোকের আদেশে রাজধানী পাটলিপুত্রে অচিরে "অশোকারাম" নামক এক সুবিশাল ও সুরম্য বিহার প্রতিষ্ঠিত হইল। এখানে প্রতিদিন ষষ্টিসহস্র বৌদ্ধ-ভিক্ষু সৎকৃত হইতেন।

বৌদ্ধাচার্য্য তিষ্যের নিকটে বুদ্ধদেবের অসংখ্য উপদেশাবলীর মধ্যে তখন চতুরশীতি সহস্র উপদেশ সংগৃহীত ও প্রচলিত আছে অবগত হইয়া ধর্ম্ম-প্রাণ অশোক ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে চতুরশীতি সহস্র চৈত্য, কূপ ও জলাশয় খনন করাইলেন। যে সময়ে এ সমুদায় জনসাধারণের কল্যাণার্থে উৎসর্গ করা হয়, সে সময়ে তাঁহার বিস্তৃত সাম্রাজ্যে সপ্ত দিবস ব্যাপিয়া এক মহোৎসবের আয়োজন হইয়াছিল।

এই মহোৎসবের সময় এক অপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটিয়াছিল। সম্রাট অশোক বৌদ্ধ ধর্ম্মকে কত ভালবাসিতেন, তাঁহার হৃদয় কত উন্নত ও মহৎ ছিল, এ ঘটনায় তাহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। এক দিবস তিনি মন্ত্রিগণ ও ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিবৃত হইয়া "অশোকারাম" বিহারে অবস্থান করিতেছিলেন। এমন সময় তিনি বৌদ্ধাচার্য্য তিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, ভগবান সুগতের ধর্ম্মে কাহার দান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ?" সকলেই একবাক্যে বলিলেন, "মহারাজ! আপনার ন্যায় দাতা ভগবান বুদ্ধদেবের সময়েও কেহ ছিলেন না।" সম্রাট উৎফুল্ল-চিত্তে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এরূপ দান করিয়া কেহ কি বৌদ্ধধর্ম্মের যথার্থ

সুহৃদ্ বলিয়া গণ্য হইতে পারেন ?” এবার আচার্য্য তিষ্য উত্তর দিলেন, “নৃমণি ! আপনার ন্যায় দাতা বৌদ্ধধর্ম্মের পরমহিতৈষী ; কিন্তু যিনি ধর্ম্মার্থে নিজের পুত্র কিংবা কন্যা উৎসর্গ করিয়াছেন, তিনিই বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রকৃত বন্ধু।”

সেই বিহারে তখন বিংশতিবর্ষীয় রাজকুমার মহীন্দ্র এবং অষ্টাদশ বর্ষীয়া রাজকুমারী সঙ্ঘমিত্রা উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই সম্রাট অশোকের প্রাণাধিক প্রিয়। তিনি তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্নেহ-বিগলিত-কণ্ঠে বলিলেন, “তোমরা কি কেহ পবিত্র ভিক্ষুব্রত গ্রহণে ইচ্ছুক আছ ?” তাঁহারা উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত সন্তান। উভয়েই অকুণ্ঠিত চিত্তে পার্থিব সুখ-সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভিক্ষুব্রত গ্রহণের সম্মতি জানাইলেন। তখন অশোক অকম্পিত-কণ্ঠে সমবেত ভিক্ষুসঙ্ঘকে সম্বোধন করিয়া ভগবান তথাগতের মহান্ ধর্ম্মের সেবার্থ আপনার পুত্রকন্যাকে উৎসর্গ করিলেন। মুহূর্ত্তে তাঁহার এই অসাধারণ ত্যাগের কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল, সকলেই বিস্ময়-স্তম্ভিত প্রাণে তাঁহাকে অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। উত্তর কালে এই ভিক্ষু মহীন্দ্র ও ভিক্ষুণী সঙ্ঘ-মিত্রা কর্ত্তৃক সমগ্র সিংহলবাসী বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

সম্রাট অশোকের রাজত্বের সপ্তদশ বর্ষে, বুদ্ধদেবের মহাপরি-নির্ব্বাণের দুইশত ছত্রিশ বৎসর পরে বৌদ্ধধর্ম্মসঙ্গীতির বা বৌদ্ধ-ধর্ম্মসভার তৃতীয় অধিবেশন হয়। ইহা বৌদ্ধ-ইতিহাসের একটী বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। অশোকের আগ্রহে ও চেষ্টায় এই মহাধর্ম্মসঙ্গীতির অধিবেশন হইয়াছিল। এ অধিবেশন নয়-

মাসকালব্যাপী ছিল এবং বৌদ্ধাচার্য্য মহাস্থবির তিষ্য ইহার অধিনায়ক পদে বৃত হইয়াছিলেন।

ইতিপূর্ব্বে বৌদ্ধাচার্য্য মহাকাশ্যপ এবং মহাস্থবির রেবতের নেতৃত্বে আরও দুইটী মহাধর্ম্মসঙ্গীতির অধিবেশন হইয়াছিল। কালে কালে দুর্ব্বল-চেতা বৌদ্ধগণ দ্বারা পবিত্র বৌদ্ধধর্ম্মে যে সকল গ্লানি প্রবেশ করে, এই ধর্ম্মসভাসমূহে তৎসমুদায় সংস্কার করা হয়।

যাহা হউক, অতঃপর সম্রাট অশোক বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচারে মনোনিবেশ করেন। তাঁহার অধীন রাজ্যসমূহে, তাঁহার সাম্রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশে, অরণ্যবাসী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে, দক্ষিণ ভারতের স্বাধীন রাজ্যসমূহে, সিংহল এবং সুদূরতম মিসর, সিরিয়া, সাইরিন প্রভৃতি স্থানে উপযুক্ত ধর্ম্মপ্রচারকগণ প্রেরিত হইল। সর্ব্বত্র বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিজয়-ভেরী বাজিয়া উঠিল।

এতদ্ব্যতীত সম্রাট অশোক স্বয়ং বৌদ্ধতীর্থসমূহ অর্থাৎ বুদ্ধদেবের লীলাক্ষেত্রগুলি পরিদর্শন মানসে বৌদ্ধাচার্য্য মহাস্থবির উপগুপ্তের সহিত যাত্রা করিলেন। যে লুম্বিনী উদ্যানে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, রামগ্রামের যেখানে বুদ্ধদেব রাজ-বেশ পরিত্যাগ করিয়া মস্তক মুণ্ডন ও ভিক্ষুর পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছিলেন, গয়ার যে বোধিদ্রুম-মূলে অমিতাভ বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন, যে মৃগদাব বা সারনাথে বুদ্ধদেব সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্ম-প্রচার করিয়াছিলেন, যে কুশীনগরীতে বুদ্ধদেব মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন, সেই সেইস্থলে সম্রাট অশোক কোথায়ও বিশাল স্তূপ, কোথায়ও প্রস্তর স্তম্ভ, কোথায়ও বা সুন্দর মঠ নির্ম্মাণ

করাইয়া দিলেন। স্তূপ ও স্তম্ভ-গাত্রে, এবং মন্দির-প্রকোষ্ঠে বুদ্ধদেবের জীবন-কাহিনীর নানা অংশ চিত্রে ভাষায় ও ভাস্কর-শিল্পে বা প্রতিমূর্ত্তিতে প্রকটিত হইল। এ সকলের কোন কোনটী কালের করাল-কটাক্ষ উপেক্ষা করিয়া এখনও দর্শকগণের সসম্ভ্রম বিস্ময়-দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

সম্রাট অশোক তাঁহার বিস্তৃত সাম্রাজ্যের নানা স্থানে বহুতর গিরি-লিপি ও স্তম্ভ-লিপি ক্ষোদিত করাইয়া প্রজাসাধারণে তাঁহার মূল্যবান অনুশাসন সমূহ ঘোষণা করেন। তাঁহাকেই এবম্বিধ উৎকীর্ণ-লিপির প্রথম প্রবর্ত্তক বলা যায়। অধুনা তাঁহার সেই অনুশাসন লিপির কয়েকটি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল পাঠ করিলে সম্রাট অশোকের অলৌকিক মহাপ্রাণতা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি চমৎকৃত ও মুগ্ধ হইতে হয়। একটী অনুশাসনে তিনি বলিতেছেন—

"আমি ভোজনে ব্যাপৃতই থাকি, বা অন্তঃপুরে, নিভৃত কক্ষে, যানে বা প্রমোদ উদ্যানেই থাকি, সর্ব্বত্রই, আমার যে বার্ত্তাহরগণ আছে, তাহারা আমাকে প্রজাগণের প্রয়োজন জ্ঞাপন করিবে। এইরূপে আমি সর্ব্বত্রই প্রজাগণের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকি। কারণ সর্ব্বপ্রজাগণের কল্যাণ-সাধনই আমার কর্ত্তব্য মনে করি। সর্ব্বজনের হিতসাধন অপেক্ষা মহত্তর কার্য্য নাই। এ জগতে আমি অপর সকলকেই সুখী করিতে চেষ্টা করি—পরজগতে তাহারা স্বর্গলাভ করুক্।" সম্রাট অশোক কি প্রকার অকপট-চিত্তে তাঁহার প্রজাবৃন্দের মঙ্গল-কামনা করিতেন, তাঁহার প্রজা-

প্রীতি কতদূর গভীর ছিল, উদ্ধৃত বাক্যগুলি পাঠ করিলে তাহা অনায়াসে বুঝা যায়।

অপর একটী স্তম্ভলিপিতে সম্রাট অশোক অপরাপর বহু-প্রাণীর সহিত ক্ষুদ্র পিপীলিকাটী পর্য্যন্ত বধ করিতে প্রজাবর্গকে নিষেধ করিয়াছেন। অশোকের ন্যায় একজন প্রবলপরাক্রান্ত রাজচক্রবর্ত্তী নগণ্য পিপীলিকাটীকে পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়েন নাই—তিনি তাহাদিগেরও কল্যাণ-কামনা করিতেছেন, ইহা ভাবিতে গেলেও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি, সম্রাট অশোক একখানা শিলা-লিপিতে বলিয়াছেন, "সর্ব্বজনের হিত-সাধন অপেক্ষা মহত্তর কার্য্য নাই।" এই মহৎ কার্য্য যাহাতে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দররূপে সম্পাদিত হয়, তজ্জন্য তিনি সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। তাঁহার আদেশে তাঁহার বিপুল সাম্রাজ্যে বহু দাতব্য-চিকিৎসালয়, পশু-চিকিৎসালয়, আতুরাশ্রম, ভেষজাগার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এক একটী বৌদ্ধ-বিহার বিদ্যাচর্চ্চার প্রধান ক্ষেত্ররূপে পরিগণিত হইয়াছিল। নব নব রাজ-বর্ত্ম সকল নির্ম্মিত ও নব নব জলাশয় প্রভৃতি খনিত হইয়াছিল। এ সমস্তেরই অপরিমেয় ব্যয়-ভার রাজ-কোষ হইতে প্রদত্ত হইত। এরূপে সম্রাট অশোক তদীয় প্রজাবর্গকে আপনার সন্তানের ন্যায় জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেন—তাহাদের ইহপর-কালের সুখসমৃদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করিতেন। প্রকৃত প্রস্তাবে, তাঁহার বিশাল অন্তঃকরণের ছায়ায় প্রকৃতিপুঞ্জ পরম সুখে, শান্তিতে ও

নিরুপদ্রবে জ্ঞান ও ধর্ম্মের আলোচনা করিয়া সত্যসত্যই যেন "রাম-রাজ্যে" বাস করিত।

আমরা অনেকেই রাজর্ষি জনকের কথা অবগত আছি। আমরা জানি, তিনি রাজ্যেশ্বর হইলেও সংসার-বিমুক্ত সন্ন্যাসীর মত কিরূপ নিষ্কাম ও নির্লিপ্ত ভাবে সর্ব্বদা স্বীয় কর্ত্তব্য প্রতি-পালন করিতেন। সম্রাট অশোকের পবিত্র চরিত্রেও এ মহান্ ভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তাঁহার রাজ্যাভিষেকের একাদশ বর্ষকালে তিনি ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের সমস্ত উপদেশ যথাযথভাবে প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করেন। সকল প্রকার রাজৈশ্বর্য্যে নিয়ত পরিবৃত থাকিয়াও কোন রাজচক্রবর্ত্তী যাবতীয় পার্থিব-ভোগ-বিলাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবলমাত্র স্বধর্ম্ম-রক্ষণে ও প্রজাবৃন্দের হিত-সাধনে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন, এ দৃশ্য কত মহান্!—বাস্তবিক এরূপ "ভিক্ষু-সম্রাট" শুধু ভারতের কেন, জগতের ইতিহাসেরও শ্রেষ্ঠ গৌরব।

সুদীর্ঘ ষষ্টিবৎসর এবম্বিধ গৌরবের সহিত সম্রাট অশোক রাজ্যশাসন কল্পে প্রজাদিগের মঙ্গল সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোক-যাত্রার অব্যবহিত-পূর্ব্ব সময়ের একটী বিচিত্র কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতির নিমিত্ত একশত কোটি সুবর্ণ মুদ্রা দান করিতে অভিলাষ করেন। ছিয়ানব্বই কোটি সুবর্ণ মুদ্রা বিতরিত হইলে যুবরাজ সম্পদী মন্ত্রীগণের পরামর্শে ইহার প্রতিবাদী হয়েন। তখন সম্রাট অশোক প্রত্যহ আহারান্তে আপনার সুবর্ণনির্ম্মিত ভোজনপাত্রগুলি বৌদ্ধ-বিহারে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। যুবরাজ সম্পদী সম্রাট অশোকের জন্য

স্বর্ণ-পাত্রের পরিবর্ত্তে রৌপ্য পাত্রের ব্যবস্থা করিলেন। সম্রাট অশোক তাহাও প্রতিদিন বৌদ্ধ-মঠে উপহার পাঠাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার আহারের জন্য লৌহপাত্র নির্দ্দিষ্ট হইল। সম্রাট তাহাও বৌদ্ধ-চৈত্যে পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন। অবশেষে তাঁহার জন্য মৃন্ময়-পাত্রের ব্যবস্থা হইল।

এ সময় সম্রাট অশোক একদিন একটী আমলকের অর্দ্ধাংশ হস্তে লইয়া স্মিত-কণ্ঠে মন্ত্রিবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মন্ত্রিগণ! বল দেখি, এখন এ দেশের রাজা কে?" তাঁহারা সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া যুক্ত করে উত্তর দিলেন, "প্রভু, আপনিই এদেশের রাজা।" সম্রাট বলিলেন, "তোমরা যাহা বলিলে, তাহা যথার্থ নহে। আমি রাজ্যচ্যুত হইয়াছি। এক্ষণে এই আমলকখণ্ডটী ব্যতীত আমার আর কোন সম্বল নাই। ইহাও আমি বৌদ্ধ-বিহারে দান করিতেছি।" তাহার পর কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া সম্রাট অশোক পুনর্ব্বার প্রধান মন্ত্রী রাধাগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সচিববর! বল দেখি, এখন এদেশের রাজা কে?" রাধাগুপ্ত প্রণতঃ হইয়া উত্তর দিলেন, "প্রভু, আপনিই এ দেশের রাজা।" এ কথা শুনিয়া সম্রাট আপনার আসন পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "আজ আমি ভগবান তথাগতের সঙ্ঘকে সসাগরা পৃথিবী দান করিলাম। যুগযুগান্তর ধরিয়া ত্রিরত্নের জয়-গাথা এখানে উচ্চারিত হউক্! আর যদি আমার এ দানের কোন পুরস্কার থাকে, তবে যেন আমি আত্ম-সংযম করিয়া আপনার আত্মার উপর প্রভুত্ব লাভ করিতে পারি। করুণাময় বুদ্ধদেব

সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন!” অনন্ত আকাশে প্রতিধ্বনি মিলাইবার পূর্ব্বেই সম্রাট অশোকের মধুর-কণ্ঠ চিরকালের জন্য নীরব হইয়া গেল; তিনি অকস্মাৎ মানব-লীলা সম্বরণ করিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র।

যাঁহারা উদগ্র সাধনার বলে আমাদিগের মাতৃভাষাকে জগতের সমক্ষে এতাদৃশ শক্তিশালিনী ও গৌরবান্বিতা করিয়া গিয়াছেন, মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ইনি ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জুন তারিখে (১৩ই আষাঢ়, ১২৪৫) চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত কাঁঠালপাড়া নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অতিশয় যশস্বী ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের পাঁচ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতার কর্ম্মস্থল মেদিনীপুরে তাঁহার হাতে খড়ি হয়। তাহার এক বৎসর পরে তিনি সেখানকার জেলা স্কুলে ভর্ত্তি হয়েন। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কাঁঠালপাড়ার বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন এবং হুগলি কলিজিয়েট স্কুলে প্রবেশ করেন। কি বিদ্যালয়ে, কি গৃহে, সর্ব্বত্রই বালক বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রে এক অসামান্য তেজস্বিতা ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইত।

যখন বঙ্কিমচন্দ্রের দশ কি এগার বৎসর বয়স, তখন

একদিন হঠাৎ সংবাদ পাওয়া গেল যে, তাঁহাদের বাড়ীতে শীঘ্রই ডাকাতি হইবে। বাড়ীর অভিভাবকেরা বহু পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, বালকবালিকা ও স্ত্রীলোকদিগকে স্থানান্তরে পাঠাইতে হইবে। সকলে তাঁহাদের সে পরামর্শ নীরবে গ্রহণ করিল। কিন্তু তেজস্বী বালক বঙ্কিমচন্দ্র একেবারে বাঁকিয়া বসিলেন, তিনি সদর্পে বলিলেন, "তাহা কখনও হইতে পারে না, আমরা বাড়ী ছাড়িয়া কোথায়ও যাইব না।" তখন তাঁহাকে ডাকাতের ভয় দেখান হইল, ডাকাত আসিয়া সকলকে কাটিয়া ফেলিতে পারে, সে কথাও বলা হইল। তথাপি নির্ভীক বঙ্কিম-চন্দ্র কিছুমাত্র টলিলেন না, তিনি সতেজে উত্তর করিলেন, "ডাকাতদের কি সাধ্য আমাদের কাটিয়া যায়! বাড়ীতে এত লোকজন, পাড়াতে এত লাঠিয়াল, সকলে একজোট হইলে ডাকাতের ডাকাতি করা ঘুচিয়া যাইবে।" ফলেও তাহাই হইল। অভিভাবকেরা বীর-বালক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, ডাকাতেরা ডাকাতি করিতে আসিয়া ফিরিয়া গেল। সেই দিন হইতে গুরুজনেরা বঙ্কিমচন্দ্রকে "বাঁকা" বলিয়া ডাকিতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে হুগলী কলেজ হইতে সিনিয়র স্কলার্শিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় গমন করেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন পড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু আইন অধ্যয়ন তাঁহার মনঃপূত না হওয়ায় তিনি অচিরে উহা পরিত্যাগ করিয়া পরবর্ত্তী বৎসর বি, এ, পরীক্ষা দিলেন এবং সসম্মানে উত্তীর্ণ হইলেন। ইহার অল্প কাল পরেই তিনি

ডেপুটি কালেক্টারি পদে নিযুক্ত হয়েন এবং তাঁহার প্রথম কর্ম্ম-স্থান যশোহরে গমন করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত কর্ত্তব্যপরায়ণ, সুনিপুণ ও ন্যায়দর্শী বিচারক ছিলেন। তিনি আইনের চক্ষে কি ধনী, কি দরিদ্র, কি দেশী, কি বিদেশী সকলকেই সমানভাবে দেখিয়া অতীব বিচক্ষণতার সহিত বিচার কার্য্য সম্পাদন করিতেন। স্বীয় কর্ত্তব্যপালনের জন্য তিনি কোনরূপ বিপদ আপদে ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। এ জন্য তাঁহার বহুমূল্য জীবন বহুবার গুরুতর সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হইয়াছিল। তথাপি তাঁহার দুর্দ্দমনীয় সাহস কখনও খর্ব্ব হয় নাই।

যখন বঙ্কিমচন্দ্রের বাইশ কি তেইশ বৎসর বয়স, তখন তিনি খুলনা মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। সে সময় জনৈক দুর্দ্দান্ত নীলকর সাহেব হাতীর শুঁড়ে মশাল বাঁধিয়া একখানি গ্রামের অসহায় নরনারীর গৃহগুলি ভস্মসাৎ করিয়াছিল। তখন বেঙ্গল পুলিশের সৃষ্টি হয় নাই, ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীনে পুলিস কাজ করিত। পূর্ব্বোক্ত নীলকর সাহেবের নিকটে সর্ব্বদা গুলি ভরা পিস্তল থাকায় কোন দারোগা তাহাকে সাহস করিয়া ধরিতে পারিল না। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র আপনার বিপদের কথা চিন্তা না করিয়া সেই গুলিভরা পিস্তলসহ সাহেবটীকে গ্রেপ্তার করিলেন। হাইকোর্টের বিচারে সে দণ্ডিত হইয়াছিল।

এবংবিধ অসমসাহসিকতা ও দক্ষতা বঙ্কিমচন্দ্রের চিরকাল ছিল। এ জন্য উত্তরকালে গুণ-গ্রাহী গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে যথাক্রমে "রায়বাহাদুর" ও "সি, আই, ই" উপাধিতে ভূষিত

করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

পাঠ্যাবস্থাতেই বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গভাষায় মধ্যে মধ্যে পদ্য রচনা করিয়া "প্রভাকর" প্রভৃতি সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিতেন। সেই সময় তিনি "মানস ও ললিতা" নামক একখানি ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাহার বহু বৎসর পরে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সুবিখ্যাত উপন্যাস "দুর্গেশনন্দিনী" প্রকাশিত হয়। তাঁহার মনোমোহিনী রচনায় ও কল্পনায় বঙ্গবাসী মুগ্ধ হইল। ইতিপূর্ব্বে ইংরাজীশিক্ষিত বাঙ্গালীরা আপনাদিগের মাতৃভাষার দৈন্য ঘুচাইতে চেষ্টা না করিয়া তাহাকে একান্ত অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস "দুর্গেশনন্দিনী" তাঁহাদের সেই মনের গতি ফিরাইয়া দিল; তাঁহারা বিস্ময়ে ও আনন্দে বুঝিতে পারিলেন, আমাদের মাতৃভাষা নিপুণ শিল্পীর সহায়তা লাভ করিলে কিরূপ মহার্হ রত্ন দান করিতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় উপন্যাস লিখিবার রীতি প্রচলিত ছিল না; বঙ্কিমচন্দ্রই ইহার আদি প্রবর্ত্তক। তিনি ইহার প্রথম পথ প্রদর্শক হইলেও এ পর্য্যন্ত কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই; এখনও তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী আমাদের মাতৃভাষার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহা সামান্য কৃতিত্ব ও গৌরবের কথা নহে।

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার "কপালকুণ্ডলা" এবং ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে "মৃণালিনী" নামক উপন্যাস প্রকাশ করেন।

এই দুইখানি পুস্তকও পাঠক সমাজে অভিনব আন্দোলন উপস্থিত করে এবং ইহা দ্বারা আমাদের মাতৃভাষার প্রতি সকলের সম্ভ্রম-দৃষ্টি আরও আকৃষ্ট হয়। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রও সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক সাদরে অভিনন্দিত হয়েন।

১২৭৯ সালের ১লা বৈশাখ (১৮৭২ খৃষ্টাব্দ) বঙ্গদেশের বিশেষ শুভদিন। এই দিনে বঙ্কিমচন্দ্র "বঙ্গদর্শন" নামক একখানি অত্যুৎকৃষ্ট মাসিক পত্র প্রচার করেন ও ইহাতে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস "বিষবৃক্ষ" মুদ্রিত হইতে থাকে। বঙ্গের তৎকালীন উদীয়মান ও প্রতিভাবান লেখকগণ, যাঁহারা পরবর্ত্তী যুগে বিশেষ খ্যাতনামা ও বরণীয় হইয়াছিলেন এবং যাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সাহিত্য-সাধনার দ্বারা অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের গৌরবোজ্জ্বল চন্দ্রাতপ তলে সম্মিলিত হইলেন। ফলে "বঙ্গদর্শন" বঙ্গসাহিত্যের এক অপূর্ব্ব নবযুগের সূচনা করিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদকতায় "বঙ্গদর্শন" পাঁচ বৎসর পরিচালিত হইয়াছিল। তৎপরে তাঁহার অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র ইহার সম্পাদকতার ভার গ্রহণ করেন। "বঙ্গদর্শনে" বঙ্কিমচন্দ্রের "বিষবৃক্ষ" ব্যতীত "যুগলাঙ্গুরীয়" "চন্দ্রশেখর" "রাধারাণী" "কৃষ্ণকান্তের উইল" "কমলাকান্তের দপ্তর" "আনন্দমঠ" "রজনী" প্রভৃতি কয়েকখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস ও বহু সমালোচনা ও গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে এ সমস্তই পুস্তকাকারে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। এ সকল পুস্তকে বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা এত অধিক পরিমাণে

বিকশিত হইয়াছে যে, তাঁহার যে কোন গ্রন্থ তাঁহাকে বিশ্ব-সাহিত্যক্ষেত্রে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্রের "দেবী চৌধুরাণী" এবং "মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত" নামক পুস্তকদ্বয় ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন বঙ্কিমচন্দ্র ক্রমে জনসাধারণকে প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার অমর লেখনী ধারণ করেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার "কৃষ্ণচরিত্র", ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার "সীতারাম" ও "বিবিধ প্রবন্ধ" এবং ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার "ধর্ম্ম-তত্ত্ব" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। তাঁহার এই সমুদায় গ্রন্থ পাঠ করিলে স্বভাবতঃ মনে হয়, এমন দূরদর্শী ও সূক্ষ্মদর্শী লেখক ভারতবর্ষে বহুকাল জন্মগ্রহণ করেন নাই—পুরাকালীন মুনিঋষি-গণের পর এমন দিব্য প্রতিভাবান কোন মহাত্মা জনসাধারণের সার্ব্বজনীন মঙ্গলার্থ লেখনী পরিচালনা করিতে অগ্রসর হয়েন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের একমাত্র "ধর্ম্মতত্ত্ব" পুস্তকের উপদেশ অনুসারে জীবন গঠন করিতে পারিলে, মানব প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে।

মাতৃভাষার সর্ব্বপ্রধান উপাসক লোকগুরু বঙ্কিমচন্দ্র অক্লান্ত মানসিক পরিশ্রমহেতু কৃচ্ছ্র-সাধ্য বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হয়েন এবং তাহাতেই ১৩০০ সালের ২৬শে চৈত্র তারিখে অক্ষয় অমৃত লোকে মহাপ্রয়াণ করেন। সে দিন বঙ্গদেশ তাঁহার যে কৃতীসন্তান হারাইলেন, তাঁহার অভাব আর শীঘ্র পূর্ণ হইবে না।

সাধ্বী রাবেয়া।

অদ্য যে ধর্ম্মশীলা রমণীর পবিত্র কাহিনী তোমাদিগকে বলিতেছি, প্রায় দ্বাদশ শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পুণ্য-সৌরভে সমস্ত ইসলাম-জগত আমোদিত হইত। তৎকালীন মহাজনগণ তাঁহার অতুল ধর্ম্ম-ভাব-দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার পবিত্র সংসর্গ লাভার্থ সর্ব্বদা লালায়িত থাকিতেন। বস্তুতঃ তাঁহার জীবন অতীব মহৎ ও গৌরবান্বিত ছিল।

তুরস্কদেশের অন্তর্গত বসোরা নগরী-নিবাসী এক দরিদ্র দম্পতী এই অসামান্য কন্যারত্ন লাভ করিয়াছিলেন। আরবী ভাষায় "রাবা" অর্থে "চারি" বুঝায়। তিনি সেই দরিদ্র গৃহস্থের চতুর্থ কন্যা ছিলেন বলিয়া "রাবেয়া" নামে আখ্যাতা হইয়াছিলেন। বসোরা নগরী তাঁহার জন্মভূমি বলিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে "রাবেয়া-বসোরী"ও বলিতেন। তাঁহার শৈশব ও কৈশোর-জীবন দরিদ্রের পর্ণ-কুটীরে, পিতামাতার স্নেহ-অঙ্কে একপ্রকার সুখেই অতিবাহিত হইয়াছিল। যে ধর্ম্মভাব আজি তাঁহাকে জগতে প্রাতঃস্মরণীয়া করিয়া রাখিয়াছে, অতি শৈশবেই অলক্ষিত ভাবে তাহার অঙ্কুর তাঁহার জীবনে দেখা যাইত। তিনি স্বীয় চরিত্র-মাধুর্য্যে জনক-জননীর দারিদ্র্য-ক্লেশ অপনীত করিয়া, বিজন কাননস্থিত কুরঙ্গ-শাবকের ন্যায় নির্ভয়ে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেন।

কিন্তু অচিরে বালিকা রাবেয়ার সুখ-স্বপ্ন ভঙ্গ হইল,—দুরন্ত

কাল তাঁহার পিতামাতাকে যুগপৎ হরণ করিল। তাঁহাদের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই যেন রাবেয়ার দুঃখের মাত্রা আরও বাড়াইবার নিমিত্তই বসোরাভূমি ঘোরতর দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হইল। তিনি আপন সহোদরাগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন;—এক দুর্ব্বৃত্ত তাঁহাকে অসহায় অবস্থায় পাইয়া কয়েকটী তাম্রমুদ্রার বিনিময়ে জনৈক ধনীর নিকটে বিক্রয় করিল। তাঁহার প্রভু একান্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি রাবেয়াকে সর্ব্বদা তাঁহার সাধ্যাতীত পরিশ্রমের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে নিদারুণ যন্ত্রণা দিতেন। একদিন রাবেয়া আর এই কঠোর যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া প্রভুর আলয় হইতে পলায়ন করেন। কিন্তু ব্যস্ততাপ্রযুক্ত তিনি পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া যান, তাহাতে তাঁহার একটী হস্ত ভগ্ন হইয়া যায়। তখন তিনি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার অন্তরের অন্তস্তল ভেদ করিয়া এই প্রার্থনা-বাণী ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল, "প্রভো! তুমি জান আমি কত দুঃখিনী। আমার হস্তও ভগ্ন হইল, কিন্তু তাহাতে আমার শোক করিবার কি আছে? হে পিতঃ, আমি কেবল তোমার প্রসন্নতা চাই। বল, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন আছ কিনা?" তদুত্তরে যেন এই দৈব-বাণী তাঁহার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইল—"বৎসে! অশ্রু সংবরণ কর, অচিরে তোমার কষ্ট দূর হইবে; তুমি দেবগণেরও স্নেহের পাত্রী হইবে।" এই অপূর্ব্ব স্বর্গীয় বাণী শ্রবণে রাবেয়ার সন্তপ্ত হৃদয় শান্তিরসাপ্লুত হইয়া শীতল হইল। তিনি আশ্বস্ত-চিত্তে স্বকীয় প্রভুর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তদবধি তিনি দিবা-

ভাগে প্রভুর সেবায় এবং রাত্রিকালে স্তুতি-আরাধনাদি দ্বারা বিশ্ব-প্রভুর পরিচর্য্যায় নিযুক্তা হইলেন। তাঁহার ধর্ম্মজীবন দিন দিন প্রীতি প্রেম প্রভৃতি কুসুমে পরিশোভিত হইয়া নবকুসুমিতা মাধবীলতার ন্যায় মাধুর্য্যশালী হইতে লাগিল। তিনি শত পীড়নের মধ্যেও স্থিরচিত্তে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

কিন্তু এ ভাবে তাঁহাকে আর অধিক কাল কাটাইতে হইল না। পরমপিতা পরমেশ্বর তাঁহার প্রিয়তমা কন্যাকে ঘৃণিত দাসীত্ব হইতে অচিরে মুক্ত করিয়া আপন স্নেহ-অঙ্কে স্থানদান করিলেন। একদা গভীর নিশীথকালে যখন নিখিল জগৎ নিদ্রাদেবীর সুকোমল কর-স্পর্শে অচেতন-প্রায়, তখন সহসা রাবেয়ার প্রভু জাগরিত হইয়া গৃহান্তরে সকরুণ প্রার্থনা-ধ্বনি শ্রবণ করিলেন। তিনি সবিস্ময়ে শয্যাত্যাগ করিয়া সেই কুঠরীর নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন, রাবেয়া ভগবানের আরাধনায় নিযুক্ত, তাঁহার কমনীয় মস্তক নিভৃতে ভূলুণ্ঠিত হইতেছে। এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় জ্যোতিঃ তাঁহার বদনমণ্ডল হইতে বিনির্গত হইয়া তাঁহার দেহের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়াছে; অন্ধকার গৃহ তাহাতেই আলোকিত হইতেছে। রাবেয়া যুক্ত-করে করুণ-স্বরে বিধাতার চরণে নিবেদন করিতেছেন,—"প্রভু, পরমেশ্বর! তুমি জান, আমার দীন-হৃদয় সর্ব্বদা তোমার আজ্ঞাপালনে কত উৎসুক। আমার এ দেহ-মন প্রতিমুহূর্ত্তে তোমার সেবায় নিযুক্ত রাখিতে কত অভিলাষ। কিন্তু তুমি আমায় পরাধীনা দাসী করিয়া রাখিয়াছ, তাই প্রত্যহ বিলম্বে তোমার চরণতলে উপস্থিত হইয়া থাকি। তুমি এ জন্য তোমার এই দীনা তনয়াকে মার্জ্জনা করিও।"

গৃহ-স্বামীর পাষাণ হৃদয় এ অলৌকিক ব্যাপার দর্শনে ও রাবেয়ার সুমিষ্ট প্রার্থনা-বাণী শ্রবণে স্তম্ভিত ও দ্রবীভূত হইয়া গেল। ভয় ও ভক্তি মিশ্রিত কি এক অদ্ভুত ভাবের বন্যা তাঁহার হৃদয়-সিন্ধু আন্দোলিত করিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—'এতাদৃশী পূজনীয়া রমণীকে আমার নিজের সেবায় নিযুক্ত না রাখিয়া, বরং তাঁহার সেবাতেই আমার নিযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য।' এরূপ নানা চিন্তায় তাঁহার অবশিষ্ট রজনী উদ্বিগ্ন চিত্তে অতিবাহিত হইয়া গেল। পরদিন প্রত্যুষে তিনি রাবেয়ার নিকটে আপনার পূর্ব্বকৃত বীভৎস আচরণের জন্য কৃতাঞ্জলিপুটে ক্ষমা ভিক্ষা চাহিয়া তাঁহাকে দাসীত্ব হইতে মুক্তি প্রদান করিলেন এবং রাবেয়ার প্রতি আপন আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভক্তি জানাইয়া আমরণ তাঁহার সেবায় নিযুক্ত রহিতে চাহিলেন। কিন্তু রাবেয়া তাহাতে স্বীকৃতা না হইয়া প্রভুর অনুমতি গ্রহণান্তে গৃহ হইতে বহির্গতা হইলেন এবং কঠোর সাধনায় স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিলেন।

পিঞ্জরাবদ্ধা বন-বিহঙ্গী দৈবানুকূল্যে মুক্তি পাইলে যেরূপ মন-সুখে অনন্ত আকাশ-পথে উড্ডীন হয় এবং আপন সুমধুর কল-সঙ্গীতে বিশ্ব মুগ্ধ করে, সেইরূপ রাবেয়ার দাসীত্ব-শৃঙ্খলও দেবানুগ্রহে ছিন্ন হইলে তিনি পরমানন্দে ঈশ-প্রেমমার্গে ধাবিতা হইলেন এবং আপন পুণ্য-চরিত্রে ইস্‌লাম-জগৎ বিমোহিত করিতে লাগিলেন। এখন হইতে তাঁহার সমস্ত সময় ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণ শরীফের আলোচনা এবং উপাসনা ও সাধনাতেই অতিবাহিত হইতে লাগিল। কিয়ৎকাল তিনি এক নির্জ্জন অরণ্যপ্রদেশে

অবস্থিতি করিয়া সুকঠোর যোগাভ্যাসে রত হইলেন। তৎপর কিছুকাল এক ভজনালয়ে অবস্থান করিয়া রাবেয়া মক্কা নগরী যাত্রা করেন। মক্কাতেই তাঁহার অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। সেখানে তাঁহার সহিত অনেক সাধু মহাত্মার দর্শন লাভ ঘটিয়াছিল। তাঁহারা সকলেই রাবেয়ার অতুল ধর্ম্মভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা-প্রীতি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সাধ্বী রাবেয়া কঠোর সাধনা-প্রভাবে এরূপ উচ্চ ধর্ম্ম-জীবন লাভ করিয়াছিলেন যে, নানা দিগেদশ হইতে শত শত নরনারী তাঁহার সুপবিত্র দর্শনলাভার্থ ও সুমধুর উপদেশ শ্রবণার্থ সর্ব্বদা উপস্থিত হইত। তাঁহার পবিত্র নামে সকলের মস্তক অবনত হইত। তৎকালীন ঋষিকল্প মহাত্মা হোসেন বলিতেন,—“রাবেয়া কাহারও শিক্ষা-সাপেক্ষ না হইয়া অন্তরে অলৌকিক ধর্ম্ম-জ্ঞান লাভ করিয়াছেন।” বাস্তবিক সাধু-হৃদয়ে ভগবৎ-করুণা-ছায়া প্রতিভাত হইলে মানবীয় শিক্ষা বা সাহায্যের প্রয়োজন হয় না; জ্ঞানময় পরমেশ্বরের অনন্ত জ্ঞান-রূপ একবার অন্তরে ধারণ করিলে সংসার-দগ্ধ ক্ষুদ্র জ্ঞান-অধ্যয়নের আর আবশ্যকতা থাকে না।

সাধক-শ্রেষ্ঠ হোসেন, ধর্ম্মপ্রাণা রাবেয়াকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি সপ্তাহে একদিন ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। রাবেয়াও প্রতি সপ্তাহে নিয়মিতরূপে তাঁহার উপদেশ শ্রবণার্থ গমন করিতেন। একদিবস হোসেন উপদেশ-স্থলে রাবেয়াকে উপস্থিত না দেখিয়া উপদেশ দানে বিরত ছিলেন। তখন কেহ

তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"কত শত জ্ঞানী ও ধনী এস্থলে সমবেত হইয়াছেন, আপনি একটী বৃদ্ধানারীর অপেক্ষায় চুপ করিয়া রহিয়াছেন কেন?" মহাত্মা হোসেন তদুত্তরে বলিয়াছিলেন—"যে সরবত হস্তীর জন্য প্রস্তুত, তাহা ক্ষুদ্র পিপীলিকাকে দিতে পারি না।" তাপসবর হোসেন উপদেশদানকালে যখন বলিতে বলিতে উৎসাহে মাতিয়া উঠিতেন, যখন তাঁহার মুখ হইতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গবৎ বাক্যাবলী বিনির্গত হইয়া শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ ও উত্তেজিত করিত, তখন তিনি রাবেয়ার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিতেন,—"এই সকল তেজ তোমারই হৃদয়ের তেজ হইতে উৎপন্ন হইতেছে।" কি গভীর শ্রদ্ধাপূর্ণ বাণী!

সাধ্বী রাবেয়া আমরণ কুমারীব্রত প্রতিপালন করিয়া চরিত্রবলের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। একদা মহাত্মা হোসেন রাবেয়ার পরিণয়ের অভিলাষ আছে কিনা, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ঈশগত-প্রাণা রাবেয়া তদুত্তরে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "হোসেন! তুমি কি আমার শরীর সম্বন্ধে বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমার শরীর কোথায়? তাহা যে পরম-স্বামীর সেবায় উৎসর্গ করিয়াছি; তাহা যে সর্ব্বদা তাঁহারই আদেশ পালনে ব্যস্ত, সর্ব্বদা তাঁহারই কার্য্যসাধনে তৎপর! আমার আবার পরিণয়ের ইচ্ছা বা অনিচ্ছা কি?"

সাধ্বী রাবেয়া সাক্ষাৎ-প্রত্যক্ষ-ভাবে ঈশ্বরকে বিশ্বাস ও ভক্তি করিতেন। ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণ শরিফের রচনাবলীর উপরেও তাঁহার অশেষ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল। একবার তিনি জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "আমি ঈশ্বরকে না দেখিলে পূজা করিতাম

না।” আর একবার দুইজন সাধুপুরুষ রাবেয়ার দর্শনার্থ উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই ক্ষুধিত ছিলেন। রাবেয়া তাহা জানিতে পারেন। তখন তাঁহার নিকটে দুইখণ্ড মাত্র রুটি ছিল, তিনি তাহাই তাঁহাদের সমক্ষে উপস্থিত করিলেন। এমন সময় একটী ভিক্ষুক আসিয়া তাহা ভিক্ষা চাহিল। রাবেয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে রুটি দুইখানি ভিক্ষুককে দান করিলেন। ইহা দেখিয়া অভ্যাগতদ্বয় কিছু মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহার অল্পক্ষণ পরেই একজন পরিচারিকা কয়েক খণ্ড রুটি হস্তে করিয়া রাবেয়ার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিল, “আমাদের গৃহস্বামিনী এগুলি আপনার সেবার্থে পাঠাইয়াছেন।” রাবেয়া তাহা গ্রহণ করিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই রুটিগুলি গণনা করিয়া দেখিয়া দাসীকে প্রত্যর্পণ করিলেন এবং বলিলেন, “ফিরাইয়া লইয়া যাও, তোমার ভুল হইয়াছে।” দাসী বলিল, “আমার কর্ত্রী-ঠাকুরাণী ঐ রুটিগুলি আপনাকেই দিতে বলিয়াছেন;” রাবেয়া পুনরায় বলিলেন, “না, ফিরাইয়া লইয়া যাও, ভুল হইয়াছে।” পরিচারিকা তখন রুটিগুলি বাড়ীতে ফিরাইয়া আনিল এবং আপন প্রভুপত্নীকে সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিল। কর্ত্রীঠাকুরাণী আরও দুইখানি রুটি তাহার সঙ্গে যোগ করিয়া দিয়া দাসীকে পুনর্ব্বার রাবেয়ার নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। রাবেয়া এবার গণনায় বিশখণ্ড রুটি পাইয়া গ্রহণ করিলেন এবং সানন্দ চিত্তে তাহা সাধু-সেবায় নিয়োজিত করিলেন। সাধুদ্বয় আহারান্তে রাবেয়াকে এই ব্যাপারের নিগূঢ় রহস্য জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, “আপনারা ক্ষুধার্ত্ত আছেন বুঝিতে পারিয়া আমার

যথাসম্বল রুটি দুইখানি আপনাদের সৎকারার্থ উপস্থিত করিয়াছিলাম। কিন্তু ইতিমধ্যে যখন ঐ ভিক্ষুক আসিয়া উহা প্রার্থনা করিল, তখন ঐ রুটি দুইখানি তাহাকে অর্পণ করিয়া ভাবিলাম, 'প্রভো! তুমি বলিয়াছ, মনুষ্যকে তাহার দানের দশগুণ পুরস্কার দিয়া থাক, আমি ঐ কথা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি, এক্ষণে তোমারই সন্তোষার্থ ইহা দান করিলাম।' পরে যখন দৈববশে আঠার খণ্ড রুটি উপস্থিত হইল, তখন ভুল হইয়াছে মনে করিয়া ঐগুলি ফিরাইয়া দিলাম। পরে আমার দত্ত দুইখণ্ড রুটির পরিবর্ত্তে তাহার দশগুণ বিশখণ্ড রুটি পাইলাম।" অভ্যাগত সাধুদ্বয় এই অদ্ভুত ঘটনায় রাবেয়ার উচ্চ-ধর্ম্ম বিশ্বাসের পরিচয় পাইয়া একান্ত বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলেন এবং সাধ্বী রাবেয়ার পবিত্র সঙ্গলাভে আপনাদের প্রাণ মন পবিত্র ও সার্থক বিবেচনা করিলেন।

সাধ্বী রাবেয়ার অত্যন্ত দৈন্যাবস্থা ছিল। তিনি ইষ্টকের উপর স্বীয় মস্তক রক্ষা করিয়া একখানি পুরাতন জীর্ণ দরমাতে শয়ন করিতেন। তাঁহার পরিধেয় বসনও অতিশয় মলিন ও জীর্ণ ছিল। একটি মাত্র ভগ্ন জলপাত্র দ্বারাই তাঁহার জলপান ও আচমন ক্রিয়াদি নিষ্পন্ন হইত। কোনও ব্যক্তি তাঁহার এই দীনতা মোচন করিতে চাহিলে তিনি বলিয়াছিলেন,—"তোমার অতিশয় ভ্রম হইতেছে, তোমরা কেহই আমার অভাব-মোচনকারী নও। যিনি প্রকৃত অভাবমোচনকারী, তিনি কি কখনও ধনীকে ধনবান বলিয়া স্মরণ করেন এবং দরিদ্রকে ধনহীন বলিয়া বিস্মৃত হইয়া থাকেন? এ সংসার যাঁহার রাজ্য, তাঁহার

নিকট হইতে আমার যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা ভিক্ষা চাহিয়া লইব।" আর একবার একজন ধনী রাবেয়াকে একটী মুদ্রাপূর্ণ থলী উপহার দিতে আসিয়াছিলেন ; কিন্তু রাবেয়ার কঠোর আত্ম-সংযম ও নিস্পৃহতা তাঁহাকেও শঙ্কিত ও বিফল-মনোরথ করিয়া-ছিল। রাবেয়া এই বলিয়া প্রার্থনা করিতেন, "হে প্রভো! তুমি এ জন্মে আমার জন্য যাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছ, তাহা তোমার শত্রুকে দাও ; পরজন্মে যাহা আমার জন্য রাখিয়াছ, তাহা তোমার বন্ধুকে দাও। হে ঈশ্বর! আমি যদি নরকের ভয়ে তোমার পূজা করি, তবে আমাকে নরকানলে দগ্ধ কর। স্বর্গলোভে যদি তোমার সেবা করি, তবে তাহা হইতে আমায় বঞ্চিত কর। কিন্তু যদি শুদ্ধ তোমারই জন্য তোমার পূজা করিয়া থাকি, তবে উজ্জ্বলতররূপে তোমার সৌন্দর্য্যদর্শন হইতে আমায় বঞ্চিত করিও না।" ভগবচ্চরণে এমন সুন্দর উচ্চভাব-পূর্ণ আত্মনিবেদন করিতে পারিতেন বলিয়াই তিনি কখনও পার্থিব দীনতাকে ভ্রূক্ষেপ করিতেন না ; এবং এজন্যই তিনি অন্যত্র বলিতে পারিয়াছিলেন, "আমার নিকটে শত্রু মিত্র উভয়ই সমান।"

সাধ্বী রাবেয়া ঈশ্বরকে কত ভালবাসিতেন, একদিনের একটী ঘটনায় তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। একদা কোনও ব্যক্তি শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হইয়া স্বীয় মস্তকে একপ্রকার পটী বন্ধন করিয়াছিল। ভগবৎপ্রাণা রাবেয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলেন, তাহার প্রায় ত্রিশবর্ষাবধি কোনও পীড়া হয় নাই ; সে এই প্রথম রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। তখন

রাবেয়া তাহাকে বলিলেন, "তুমি এতকাল সুস্থ থাকিয়া কৃতজ্ঞতার কোন চিহ্ন শিরে বাঁধিলে না, অথচ কি আশ্চর্য্য! একদিনের অসুস্থতাতেই গ্লানির চিহ্ন মস্তকে ধারণ করিয়াছ!"

সাধ্বী রাবেয়া শেষ বয়সে নিদারুণ রোগে শয্যাশায়িনী হইয়াছিলেন। পীড়ার সময় কেহ তাঁহাকে পীড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার মন স্বর্গের জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, সেইজন্য ভগবান এই পীড়া দানে আমাকে তিরস্কার করিতেছেন।" পীড়ার সময় তাঁহার কি খাইতে ইচ্ছা করে তাহা কেহ জানিতে চাহিলে, তিনি বলিয়াছিলেন, "সুমিষ্ট খোর্ম্মাফল আমার একান্ত প্রিয়; তুমি জান, বসোরায় তাহা কত জন্মে, কিন্তু আমি এপর্য্যন্ত তাহা খাই নাই। আমি ঈশ্বরের সেবা-দাসী মাত্র, আমার আবার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা কি? আমার ইচ্ছা, প্রভুর ইচ্ছার বিরোধী হইলে, তাহা সর্ব্বতোভাবে অসঙ্গত ও পরিবর্জ্জনীয়।"—সাধ্বী রাবেয়া পরমেশ্বরে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ পূর্ব্বক অসীম ধৈর্য্যসহকারে কয়েকদিন এই রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছিলেন।

হেনরী ফসেট।

হেনরী ফসেটের জীবন-কাহিনী অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক ও শিক্ষাপ্রদ। তিনি দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া যেরূপ উন্নতপদে আরোহণ করিয়াছিলেন, কেবল তাহারই জন্য তাঁহার জীবন চির-স্মরণীয় হইবার যোগ্য ; কিন্তু তাহার উপরে তিনি আবার অন্ধ ছিলেন ; ইতিহাসে আর কোন অন্ধের এরূপ উচ্চপদে অধিরোহণ করার দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। হেনরী ফসেট দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা একজন পোষাক-বিক্রেতার দোকানে চাকরী করিতেন। ক্রমে তিনি নিজে একটী পোষাকের দোকান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং ১৮৩২ সালে তিনি যে নগরে বাস করিতেন, তাহার "মেয়র" রূপে মনোনীত হইয়া ছিলেন। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, তিনি স্থানীয় লোকের কিরূপ সম্মান ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

১৮৩৭ সালের ২৬শে আগষ্ট তারিখে সলিসবারি নগরে হেনরী ফসেটের জন্ম হয়। ফসেটের পিতা ও মাতা উভয়েরই চরিত্রে অনেক সদ্‌গুণ ছিল ; ফসেটও অনেক পরিমাণে তাহার উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। সলিসবারি নগরে মিসেস্ হ্যারিস নাম্নী একজন রমণীর একটী ছোট স্কুল ছিল ; এখানে হেনরীর শিক্ষা আরম্ভ হয়। শৈশবে তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির বিশেষ লক্ষণ

দেখা যায় নাই, বরং মিসেস্ হ্যারিসের স্কুলে তাঁহার খুব অখ্যাতিই ছিল। হেনরী বিদ্যালয়ে থাকা অপেক্ষা পথে খেলা করিতেই অধিক ভালবাসিত। মিসেস্ হ্যারিস্ কহিতেন যে, ফসেটের মত দুরন্ত ছাত্র তাঁহার স্কুলে কখনও আসে নাই। হেনরীও স্কুল হইতে বাড়ীতে আসিয়া তাহার মাতাকে বলিত, "মিসেস্ হ্যারিস্ বলেন যে, আমরা যদি এইরূপ ব্যবহার করিতে থাকি, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে মারিয়া ফেলিব ; কিন্তু কই, এত দুরন্তপনাতেও তিনি মরিলেন না।"

আট বৎসর বয়সে হেনরী সলিসবারী হইতে পাঁচ মাইল দূরে এডেলবারী নামক স্থানের একটী স্কুলে প্রেরিত হয়েন। এখানে তিনি গ্রীক, লাটিন এবং ফরাসী ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। তৎপরে ১৮৪৭ সালে তিনি কুইন উড কলেজে ভর্ত্তি হয়েন ; এই কলেজে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইত। কুইন উড কলেজে আঠার মাস শিক্ষা লাভের পর তাঁহাকে কিংস্ কলেজের স্কুলে পাঠান হইয়াছিল। ফসেটকে উচ্চশিক্ষা দেওয়া তাঁহার পিতার অভিপ্রায় ছিল না। কিন্তু এই সময় হইতে ফসেট পাঠে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইতে লাগিলেন। কুইনউড কলেজে ভর্ত্তি হওয়ার পনের দিনের মধ্যেই ফসেট কলেজের পত্রিকা "কুইন উড ক্রণিকলের" সম্পাদক মনোনীত হইলেন ; কলেজের বিতর্ক-সভায়ও তাঁহার প্রতিপত্তি হইল ; সর্ব্বোপরি, অঙ্কে তিনি বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইলেন।

ফসেটের পিতা পুত্রের শিক্ষা সম্বন্ধে সলিসবারীর ডীন ডাক্তার হামিল্টনের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন। তিনি ফসেটের

লিখিত কতকগুলি অঙ্কের উত্তর দেখিয়া বলিলেন যে, এ বালককে নিশ্চয়ই কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান উচিত। ফসেটের পিতার অবস্থা তেমন স্বচ্ছল ছিল না। সে সময়ে তাঁহার অবস্থার লোকের পুত্রদিগকে সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান হইত না। কিন্তু ফসেটের পিতা পুত্রের বুদ্ধিমত্তার কথা শুনিয়া নিজে কষ্ট করিয়াও তাহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাইতে সঙ্কল্প করিলেন। ফসেটও ইতিপূর্ব্বেই হৃদয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; এমন কি, পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করিয়া দেশের কাজ করিবেন, এই বাসনাও তাঁহার মনে প্রবল হইয়াছিল।

১৮৫১ সালের অক্টোবর মাসে উনিশ বৎসর বয়সে হেনরী ফসেট কেম্ব্রিজের পিটার হাউস কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। এ সময়ে তাঁহার আকৃতি চিত্তাকর্ষক ছিল না; কিন্তু তাঁহার দীর্ঘ দেহ, প্রকাণ্ড মস্তক, এবং লম্বা লম্বা হাত পা সৌন্দর্য্যব্যঞ্জক না হইলেও লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। প্রথমে ছাত্রেরা তাঁহার চেহারা এবং অপেক্ষাকৃত অমার্জ্জিত ব্যবহারের জন্য ফসেটকে বিদ্রূপ করিত। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা এবং মনের উন্নতির জন্য তিনি সকলের সম্মান আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সে সময়ে কেম্ব্রিজে এমন অনেক তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্র ছিলেন, যাঁহারা ভবিষ্যৎ জীবনে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ফসেট অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহাদের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহাদের সহযোগিতায় তাঁহার বিদ্যানুরাগও বাড়িয়া গেল। তিনি বিশেষ মনোযোগের

সহিত অঙ্কশাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। ভবিষ্যৎ জীবনে কার্য্যানুরোধে যদিও তিনি অঙ্কের চর্চ্চা রাখিতে পারেন নাই, তথাপি তিনি অনেক সময়েই বলিতেন যে, পঠদ্দশায় অঙ্কের চর্চ্চায় তিনি যে এত অধিক সময় নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহার জন্য তিনি কিছুমাত্র পরিতাপ করেন না। ১৮৫৬ সালে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সপ্তম স্থান অধিকার করেন। অনেকে আশা করিয়াছিলেন যে, তিনি ইহা অপেক্ষাও উচ্চ স্থান লাভ করিবেন; এমন কি, সে বৎসরের প্রথম র‍্যাংলার হইবেন। কিন্তু তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিতে সমর্থ না হইলেও তাঁহার পরীক্ষকেরা তাঁহার অঙ্কের উত্তরে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

অপর দিকে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতর্ক-সভায় বক্তৃতা শক্তির চর্চ্চা করিতেছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাল্যকালেই ফসেট পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা পূর্ণ করা তাঁহার পক্ষে সহজ ছিল না; কারণ তাঁহার অর্থ বা বংশমর্য্যাদা ছিল না। পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করিতে হইলে সাধারণতঃ অনেক অর্থ ব্যয় করিতে হয়। কিন্তু ফসেটের নিজের আয় অতি সামান্য; এবং তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিতে পারেন, এমন সঙ্গতি তাঁহার পিতারও ছিল না। এমন কি কোন উচ্চ পদস্থ আত্মীয় বা বন্ধুও ছিল না। সুতরাং ফসেটকে নিজের ক্ষমতার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইল। তিনি স্থির করিলেন যে, প্রথমে ব্যারিষ্টার হইয়া অর্থ সঞ্চয় করিবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি আইন শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৮৫৬

সালে তিনি তাঁহার কলেজের ফেলো নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার বার্ষিক ২৫০ আড়াই শত পাউণ্ড নির্দ্দিষ্ট আয় হইয়াছিল; এই আয় সম্বল করিয়া তিনি স্বীয় উচ্চ আশা চরিতার্থ করিতে অগ্রসর হইলেন। কেবল এই সকল প্রতিকূলতা অতিক্রম করিয়া তিনি যদি কৃতকার্য্য হইতেন, তাহা হইলেই তাঁহার বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেওয়া হইত। কিন্তু এই সময় ফসেটের জীবনে এমন এক নিদারুণ শোকাবহ বিপদ ঘটে, যাহাতে তাঁহার সকল আশা চূর্ণ হইয়া যাইবার উপক্রম হইল।

১৮৫৮ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর ফসেট তাঁহার পিতার সহিত পাখী শিকার করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা একটী শস্যক্ষেত্রে কতকগুলি পাখী দেখিয়া সেগুলিকে মারিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। ফসেট তাঁহার পিতা হইতে কিছু দূরে দাঁড়াইয়া পাখীগুলি যাহাতে উড়িয়া না পালায়, তাহার চেষ্টা করিতেছিলেন। ফসেটের পিতা না জানিয়া বন্দুক ছুড়িলেন; বন্দুকের দুইটী ছররা গুলি ফসেটের দুই চক্ষু ভেদ করিয়া চক্ষুর তারার পশ্চাতে গিয়া আটকাইয়া রহিল! মুহূর্ত্তের মধ্যে জগতের সমস্ত দৃশ্য ফসেটের নিকট অন্ধকার হইয়া গেল! তখনই এক খানি গাড়ী করিয়া তাঁহাকে বাড়ী লইয়া যাওয়া হইল। অনেক চিকিৎসা করা হইল, কিন্তু কোনও উপকার হইল না। তিনি চিরজীবনের মত দৃষ্টিশক্তি হারাইলেন।

ফসেটের বন্ধুগণ এই অভাবনীয় বিপদ্‌পাতে ঘোর শোকে অভিভূত হইলেন। তাঁহারা মনে করিলেন যে, ফসেট চির-

জীবনের মত অকর্ম্মণ্য হইয়া গেলেন। বিশেষতঃ তাঁহার পিতা স্বহস্তে পুত্রের সকল আশার মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন ভাবিয়া অতিশয় অনুতপ্ত হইলেন। কিন্তু ফসেট প্রফুল্লমুখে সকলকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। পরে ফসেট বলিয়াছিলেন যে, এই বিপদ্‌পাতের দশ মিনিট পরেই তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, দৃঢ়তার সহিত নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য পথে অগ্রসর হইবেন। কি আশ্চর্য্য সাহস এবং আশাশীলতা! একেত সহায় নাই, সম্পত্তি নাই, এইরূপ অবস্থায় পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশের আশা দুঃসাহসিকতার কার্য্য, ইহার উপরে একেবারে অন্ধ হইলেন! আর কেহ হইলে এই ঘোর বিপদপাতে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িতেন। কিন্তু ফসেট স্থির করিলেন যে, জীবনের যে চিত্র কল্পনায় অঙ্কন করিয়াছেন, অক্ষুব্ধচিত্তে তাহারই অনুসরণ করিবেন। বন্ধুবান্ধবগণ যখন তাঁহার এই সঙ্কল্পের কথা অবগত হইলেন সকলেই ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। কেহই তাঁহাকে আশা দিতে পারিলেন না। রোগ শয্যায় শয়ান থাকিয়া তিনি অনেকের নিকট হইতে সহানুভূতিসূচক পত্র পাইলেন; সকলেই এই আকস্মিক বিপদে দুঃখ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু আশা ও উৎসাহের কথা কেহই বলিলেন না। তথাপি ফসেট ইহাতেও কিছুমাত্র নিরুৎসাহ হইলেন না। তিনি একটু সুস্থ হইয়াই কেম্ব্রিজে আসিলেন। দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞাবলে তিনি সকল বাধা ও প্রতিকূলতা অতিক্রম করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অন্ধ, দরিদ্র ও সাধারণের অপরিচিত হইয়াও তিনি পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করিবেন, এই সঙ্কল্প

করিলেন। কিছুদিন পর্য্যন্ত তিনি ব্যারিষ্টারি করার ইচ্ছাও করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৮৫৯ সালে সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন। তিনি কেম্ব্রিজে থাকিয়া সাহিত্য চর্চ্চা করিতে লাগিলেন। দৃষ্টিশক্তি হারাইবার পূর্ব্বে যে সকল স্থান দেখিয়াছিলেন, ফসেটের মনে সেগুলির যথাযথ স্মৃতি বিদ্যমান ছিল। তিনি বিনা সাহায্যে কলেজের মধ্যে বেড়াইতে পারিতেন। ফসেট একটী বালককে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সে তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইত এবং তিনি যাহা বলিতেন, তাহা লিখিত। এইরূপে তিনি সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

ইতিপূর্ব্বে তিনি অর্থনীতি চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভা ছিল। তদুপরি তাঁহার অঙ্কশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিও ইহার পক্ষে বিশেষ সাহায্যপ্রদ হইয়াছিল। এবার কেম্ব্রিজে আসিবার অল্পদিন মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বাহিরে তাঁহার নাম হইয়া উঠিল। এই সময় হইতে তিনি ব্রিটিশ এসোসিয়েসন এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক সমাজে সমাজ-বিজ্ঞান ও অর্থনীতি বিষয়ে প্রবন্ধাদি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং এ বিষয়ে একজন অভিজ্ঞ লেখক বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিলেন। ম্যাকমিলান কোম্পানী নামক বিখ্যাত পুস্তকের দোকানের স্থাপনকর্ত্তা আলেকজাণ্ডার ম্যাকমিলান ফসেটের একজন বন্ধু ছিলেন; তখন পর্য্যন্ত তাঁহার ব্যবসায় কেম্ব্রিজেই সীমাবদ্ধ ছিল। ম্যাকমিলান ফসেটকে অর্থনীতি বিষয়ে একখানি পাঠ্যপুস্তক লিখিতে পরামর্শ দেন। তদনুসারে ১৮৬৩ সালে ফসেট অর্থনীতি বিষয়ক একখানি পুস্তক প্রকাশিত

করেন। এই পুস্তকে অর্থনীতিবিষয়ক জটিল তত্ত্বগুলিকে সরল ভাষায় বিবৃত করিয়া তিনি সাধারণের বোধগম্য করিয়াছিলেন; সেই জন্য তাঁহার পুস্তকের বিশেষ আদর হইয়াছিল, এখনও পর্য্যন্ত তাহা অনেক স্থানে পাঠ্যপুস্তকরূপে ব্যবহৃত হয়।

১৮৬৩ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। ফসেট এই পদের প্রার্থী হইলেন। আরও কয়েক জন সুপরিচিত পণ্ডিত এই পদের প্রার্থী হয়েন। ফসেটের সম্বন্ধে একটী বিশেষ আপত্তি যে, তিনি অন্ধ; ছাত্রদিগকে শাসনে রাখিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। যাহা হউক, অধিকাংশের সম্মতিতে তিনি উক্তপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং বহু বৎসর বিশেষ যোগ্যতার সহিত এই কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। ক্রমে অর্থনীতি বিষয়ে তিনি অনেকগুলি পুস্তক এবং চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

অপর দিকে তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য বিষয়েও তিনি সাহসের সহিত অগ্রসর হইয়াছিলেন। ব্রিটিশ এসোসিয়েসনে এবং অন্যান্য সভায় তিনি তৎকালান রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে কাহারও কাহারও সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রবেশ বিষয়ে পরামর্শ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ফসেটের পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশের অন্যান্য প্রতিবন্ধকের মধ্যে একটী প্রধান এই যে, তিনি নির্ব্বাচনের জন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন না। সাধারণতঃ পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশার্থীরা বহু অর্থব্যয় করিয়া নির্ব্বাচনকারীদের ভোট সংগ্রহ করেন। ফসেটের সে ইচ্ছা ছিল না। অপরদিকে

জনসাধারণের নিকট তিনি সেরূপ সুপরিচিত ছিলেন না। সুতরাং তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশের কোন সুবিধা বা আশা দেখিতে পাইলেন না। তাঁহারা যতদূর সম্ভব কোমল ভাবে তাঁহাকে এই উচ্চাশা পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন; কিন্তু ফসেট তাহা হইতে বিরত হইলেন না। ইহার অল্পদিন পরে ব্রাইটন নগরের একজন প্রতিনিধির পদ শূন্য হয়। ফসেট এখানেও চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি অন্ধ বলিয়া আপত্তি উঠিল; যে কমিটীর হাতে প্রার্থীগণের গুণাগুণ বিচার করিবার ভার ছিল, তাঁহারা বলিলেন যে, অন্যান্য বিষয়ে ফসেট সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্যতম; কিন্তু তাঁহার চক্ষুহীনতা পার্লিয়া-মেণ্টের কার্য্যের প্রতিবন্ধক। কিন্তু প্রার্থীগণের মত শুনিবার জন্য সাধারণের যে সভা হইয়াছিল, ফসেট তাহাতে উপস্থিত হইয়া যখন আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে উঠিলেন, তখন তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া অধিকাংশ লোক তাঁহার পক্ষপাতী হইল। তিনি ওজস্বিনী ভাষায় যখন আত্ম-জীবনী, তাঁহার বাল্যকালের সঙ্কল্প ও পরবর্ত্তী দুর্ঘটনা এবং নিজের দুর্দ্দমনীয় প্রতিজ্ঞার কথা বলিতে লাগিলেন, তখন সকল হৃদয় তাঁহার প্রতি সহানুভূতিতে পূর্ণ হইল। কিন্তু নির্ব্বাচন সময়ে ভোট গণনায় দেখা গেল, চারিজন সভ্য-পদপ্রার্থীর মধ্যে ফসেট দ্বিতীয় হইয়াছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ব্রাইটনে তাঁহার এমন প্রতিপত্তি হইয়াছিল যে, সকলেই বুঝিলেন পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনে তিনি নিশ্চয়ই তথাকার সভ্য মনোনীত হই-বেন। কাজেও তাহাই হইল। ১৮৬৫ সালের সাধারণ নির্ব্বাচনে ফসেট পার্লিয়ামেণ্টে ব্রাইটনের প্রতিনিধি মনোনীত হইলেন।

এতদিনে তাঁহার বাল্যকালের উচ্চ সঙ্কল্প পূর্ণ হইল বটে, কিন্তু সকলেরই মনে সন্দেহ ছিল যে, হয়ত তিনি পার্লিয়ামেণ্টের কাজ ভাল করিয়া করিতে পারিবেন না। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সে সন্দেহ দূর হইল। কয়েক মাস যাইতে না যাইতে তিনি একজন দক্ষ, সুবিজ্ঞ ও স্বাধানচেতা সভ্য বলিয়া খ্যাত হইলেন। সকলে তাঁহার কথা সম্মান ও মনোযোগের সহিত শুনিতেন। ১৮৬৫ সাল হইতে ১৮৮৪ সালে তাঁহার মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত তিনি প্রায় অবিচ্ছেদে পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য ছিলেন। পার্লিয়ামেণ্টে ফসেট সাধারণের হিতকর অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি সে সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ উদারমতাবলম্বী সভ্য বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। সে সময়ে মহামতি গ্লাডষ্টোন উদারমতাবলম্বীদিগের নেতা ছিলেন; ফসেট যদিও গ্লাডষ্টোনকে বিশেষ সম্মান করিতেন, তথাপি কর্ত্তব্যানুরোধে কোনও কোনও বিষয়ে গ্লাড-ষ্টোনের কার্য্যেরও প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। আর ভারতবর্ষ সংক্রান্ত সমুদায় প্রশ্নে তিনি ভারতবাসীদের হইয়া সর্ব্বদা সংগ্রাম করিতেন। এই জন্য লোকে তাঁহাকে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি বলিত। পরলোকগত মহাত্মা আনন্দমোহন বসু মহাশয় তাঁহার বন্ধু ছিলেন; তাঁহার নিকট হইতে ফসেট ভারতবর্ষ সংক্রান্ত অনেক অভিযোগের কথা শুনিয়াছিলেন, তিনি সর্ব্বদা তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিতেন।

১৮৮০ সালে ফসেট গ্লাডষ্টোনের অধীনে একজন মন্ত্রী মনোনীত হয়েন। গ্লাডষ্টোন তাঁহাকে পোষ্টমাষ্টার-জেনারেলের পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন এবং ফসেট তাহা গ্রহণ

করেন। গ্লাডষ্টোনের তাঁহাকে ইহা অপেক্ষাও উচ্চপদ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সে সকল পদে অনেক গোপনীয় চিঠিপত্র পড়া আবশ্যক; ফসেট স্বয়ং তাহা পড়িতে পারিবেন না বলিয়া তাঁহাকে সে পদ দেওয়া হয় নাই। তাঁহার কার্য্যকালে ফসেট ডাকঘর সংক্রান্ত কার্য্যের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন।

১৮৮৪ সালের ৬ই নবেম্বর তারিখে অল্পকয়েক দিন পীড়ার পর তিনি যখন মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন, তখন সমগ্র দেশ তাঁহার জন্য শোকে অভিভূত হইয়াছিল। তাঁহার জন্মস্থান সলিসবারীর প্রধান রাজপথে তাঁহার এক প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার একখানি তৈলচিত্র রাখা হইয়াছে; আর সেই সময়ে ভারতবাসীরা সভা করিয়া তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

সংস্কৃত সাহিত্যে একটী কথা আছে, "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ" অর্থাৎ উদ্যোগী পুরুষকে জয়শ্রী আলিঙ্গন করেন। হেনরী ফসেটের জীবন এই সত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি স্বীয় দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবলে অশেষ বাধা উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক বাল্যকালের সঙ্কল্প পূর্ণ করিয়া এবং দেশের সেবা করিয়া জীবন সার্থক করিয়াছিলেন।

গান্ধারীর আশীর্ব্বাদ।

কুরু ও পাণ্ডবের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ও মহারাজ দুর্য্যোধনের আমন্ত্রণে ভারতের রাজন্যবর্গ দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলে বিভক্ত হইয়া ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সম্মিলিত হইয়াছেন। একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধীশ্বর মহারাজ দুর্য্যোধন যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বে জননী গান্ধারীর চরণে প্রণত হইয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন।

জননী গান্ধারীদেবী সামান্যা রমণী নহেন। যেদিন জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের সহিত তাঁহার পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হয়, সেই দিন হইতে তিনি স্বীয় নয়নদ্বয় সর্ব্বদা সুদৃঢ়ভাবে বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন; পতি বিশ্বের নিরুপম সৌন্দর্য্য-দর্শন-সুখে বঞ্চিত, তিনি সুখে দুঃখে সকল বিষয়ে তাঁহার সহধর্ম্মিনী হইয়া কিরূপে তাহা উপভোগ করিবেন! এরূপ অসাধারণ পতি-ভক্তি ও ধর্ম্মশীলতা তাঁহাকে তৎকালে কঠোর তপশ্চারিণী মহিলা অপেক্ষাও সর্ব্বত্র মহীয়সী ও গরীয়সী করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি এজন্য এখনও আমাদের পূজনীয়া ও প্রাতঃস্মরণীয়া।

ধর্ম্ম-প্রাণা গান্ধারী কখনও পুত্র-স্নেহে অন্ধ ছিলেন না। তিনি কদাচ একটী মুহূর্ত্তের জন্যও দুর্য্যোধনের পাপ-বুদ্ধি-জাত ভ্রাতৃ-দ্রোহিতা অনুমোদন করেন নাই; বরং সর্ব্বদা সদুপদেশ দানে তাঁহাকে সৎপথে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিতেন। আজও যুদ্ধে গমনোৎসুক পুত্রকে ভ্রাতৃ-বিরোধ পরিত্যাগ করিয়া

সাদরে পাণ্ডবদিগকে স্বগৃহে আহ্বান করিয়া লইবার জন্য আদেশ করিলেন।

মহারাজ দুর্য্যোধন তখন কিছু মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, "মা! ক্ষমা কর। পাণ্ডু-পুত্রগণ এবং ভারতের যাবতীয় নৃপতি-বৃন্দ যুদ্ধার্থ কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছেন, আমার সৈন্যগণও সুসজ্জিত হইয়া আমার প্রতীক্ষা করিতেছে, আমি যদি এখন যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হই, তবে সকলেই বলিবে, দুর্য্যোধন প্রাণ-ভয়ে ভীত হইয়া যুধিষ্ঠিরের শরণ লইয়াছে। মা! আমি কিছুতেই সে অপমান সহ্য করিতে পারিব না! তদপেক্ষা আমার মৃত্যু সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ। কিন্তু মা! আমার সে আশঙ্কাও নাই। মহাধনুর্দ্ধর পিতামহ ভীষ্ম, অস্ত্রাচার্য্য দ্রোণ, মহাবীর কর্ণ প্রভৃতি মহারথীগণ পরিচালিত একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য আমার সহায়। আমি জানি মা! তোমার আশীর্ব্বাদ কোন দিন ব্যর্থ হয় না। আজ আমাকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন অবিলম্বে পাণ্ডুপুত্রদিগকে পরাজিত করিয়া বিজয়-গৌরবে তোমার কোলে ফিরিয়া আসি।"

জননী গান্ধারী প্রণত পুত্রের শিরশ্চুম্বন করিয়া বলিলেন, "বৎস! আমি তোমাকে কি আশীর্ব্বাদ করিব, ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি সর্ব্বদা শুধু এ কথাটী স্মরণ রাখিও—

"যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।"

যেখানে ধর্ম্ম সেখানেই জয়। অধর্ম্মাচরণ দ্বারা কেহ কখনও কোন বিষয়ে জয়যুক্ত হইতে পারে না।"

ধর্ম্ম-প্রাণা গান্ধারীর মাতৃ-হৃদয় যুদ্ধ-যাত্রী সন্তানের কল্যাণ-

কামনার্থেও ঈষৎ বিচলিত হইল না, তিনি এই ভীষণ মুহূর্ত্তেও জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া রহিলেন, বিপথ-গামী পুত্রকে বলিতে পারিলেন না "পুত্র! তুমি বিজয়ী হও!" তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার পবিত্র অন্তর হইতে স্বতঃই স্ফুরিত হইল—

"যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।"

মহারাজ দুর্য্যোধনের বীর হৃদয় মাতৃ-বাক্যে সহসা কম্পিত হইল। তিনি নিঃশব্দে জননীর পদ-ধূলি গ্রহণ করিয়া বিদায় লইলেন। তাঁহাকে আর ফিরিতে হয় নাই।

কিন্তু সেই হইতে জননী গান্ধারীর সেই মহাবাণী পবিত্র ঋষিবাক্যের মত ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত পুণ্যভূমি ভারতের সর্ব্বত্র কোটি কোটি কণ্ঠে প্রতিনিয়ত উচ্চারিত হইয়া আসিতেছে।

পরার্থ জীবন।

এমেন প্রদেশের অধীশ্বর প্রসিদ্ধ তাই বংশীয় মহাত্মা হাতেম অতিশয় দয়ালু ও দাতা ছিলেন। তাঁহার রাজভাণ্ডার সর্ব্বদা দরিদ্রের জন্য উন্মুক্ত ছিল। তাঁহার রাজ-শক্তি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়স্বরূপ ছিল। তিনি আপনাকে রাজা বিবেচনা না করিয়া প্রজাসাধারণের সেবক ও বন্ধু বলিয়াই মনে করিতেন। প্রজাগণও তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিত, বন্ধুর ন্যায় ভালবাসিত। বস্তুতঃ তাঁহার রাজ্যে সুখ ও শান্তির ইয়ত্তা ছিল না।

সহস্রমুখে হাতেমের প্রশংসা শুনিয়া আরবের প্রবল পরাক্রান্ত রাজা লাউফলের অন্তরে নিদারুণ ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হইল। বিশেষতঃ তাঁহার প্রজারা তাঁহার অপেক্ষাও হাতেমের অনুগত হইবে—হাতেমের গুণ-কীর্ত্তন করিবে, ইহা তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিলেন না। সুতরাং তিনি অবিলম্বে বিপুলবাহিনী সজ্জিত করিয়া হাতেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

সাধু হাতেম চিন্তা করিলেন, তিনি যদি লাউফলের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করেন, তবে তাঁহার জন্য বহু লোকের বৃথা রক্তপাত ও জীবন নষ্ট হইবার সম্ভাবনা; তদপেক্ষা তাঁহার রাজ্যত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়াই উচিত। ইহা ভাবিয়া উদার-চেতা হাতেম গোপনে রাজপুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং ছদ্মবেশধারণ করিয়া রাজধানীর অদূরবর্ত্তী অরণ্যে আশ্রয় লইলেন।

এদিকে লাউফল বিনা বাধায় এমেন নগর ও রাজপ্রাসাদ অধিকার করিয়া লইলেন; কিন্তু হাতেমকে না পাওয়ায় এই বলিয়া ঘোষণা করিলেন যে, হাতেমকে যে ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় ধরিয়া আনিতে পারিবে তাহাকে তিনি পঞ্চশত সুবর্ণ মুদ্রা পুরস্কার দিবেন। কিন্তু হাতেমের গুণ-মুগ্ধ প্রজারা কেহই তুচ্ছ অর্থের লোভে আপনাদের পিতৃতুল্য রাজাকে ধৃত করিতে স্বীকৃত হইল না।

একদিন এক বৃদ্ধ কাঠুরিয়া, মহাত্মা হাতেম যে অরণ্যে লুক্কায়িত ছিলেন, তথায় কাষ্ঠ আহরণ করিবার জন্য সস্ত্রীক প্রবেশ করিল। কাঠুরিয়া-পত্নী হঠাৎ তাহার স্বামীকে বলিল,

"এ বৃদ্ধ বয়সে আর বনে বনে ঘুরিতে পারি না। যদি আমাদের তেমন সৌভাগ্য থাকিত, তবে আমরা হাতেমকে ধরিয়া লাউফলের নিকটে লইয়া যাইতাম, তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে যে বিপুল অর্থ পুরস্কার দিতেন, তাহাতে আমাদের অবশিষ্ট জীবন বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যাইত।" বৃদ্ধ কাঠুরিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উত্তর দিল—"সাবধান! ওরূপ কথা আর মুখে আনিও না। আমাদের অদৃষ্টে কষ্টভোগ থাকিলে লাউফল কেন, কেহই তাহা খণ্ডন করিতে পারিবে না।"

নিত্য পরোপকারী হাতেম কাঠুরিয়া-দম্পতীর এইরূপ বাক্যালাপ শুনিয়া ভাবিলেন, 'এই ত এক পরম সুযোগ উপস্থিত। আমি যদি ইহাদের নিকট ধরা দিই, তবে এই দরিদ্র পরিবারের সকল দুঃখ অচিরে দূর হইতে পারে।' তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়া বৃদ্ধ কাঠুরিয়ার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে বলিলেন, "ভাই! আমিই হাতেম। আমাকে লাউফলের নিকটে লইয়া চল। তিনি তোমাকে পুরস্কৃত করিবেন।"

বৃদ্ধ কাঠুরিয়া সবিস্ময়ে ও সসম্ভ্রমে তাঁহার পদবন্দনা করিয়া বলিল, "সত্য বটে মহারাজ! এরূপ করিলে আমার অবস্থার উন্নতি হইতে পারে। কিন্তু আমি প্রাণ থাকিতে শত্রুকরে আপনাকে সমর্পণ করিতে পারিব না।" মহাত্মা হাতেম বলিলেন, "তুমি ত আমাকে জোর করিয়া লইয়া যাইতেছ না, আমি আপন ইচ্ছায় লাউফলের কাছে যাইতেছি। ইহাতে তোমার দোষ কি? তুমি আমাকে শীঘ্র লাউফলের নিকটে লইয়া যাও। ধন দিয়াই হউক, আর জীবন দিয়াই হউক,

লোকের উপকার করাই আমার কর্ত্তব্য।” কিন্তু বৃদ্ধ পুরস্কার প্রত্যাশায় হাতেমকে সঙ্গে লইয়া যাইতে কোন মতেই স্বীকৃত হইল না।

তখন হাতেম নিতান্ত হতাশ হইয়া কহিলেন, “তুমি যদি আমাকে লইয়া না যাও, তবে আমি স্বয়ং লাউফলের কাছে গিয়া বলিব, তুমিই আমাকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলে।” বৃদ্ধ হাসিয়া বলিল, “আপনি আমাকে বৃথা ভয় দেখাইতেছেন! যদি আপনার ন্যায় সদাশয় রাজার ভাল করিতে যাইয়া আমার মন্দ হয়, তবে মনে করিব, উহা আমার অদৃষ্টেরই দোষ।”

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় হঠাৎ কতকগুলি লোক আসিয়া তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিল এবং হাতেমকে চিনিতে পারিয়া বন্দী করিয়া লইয়া চলিল। বৃদ্ধ কাঠুরিয়া অত্যন্ত দুঃখিত মনে নীরবে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহারা হাতেমকে লইয়া নৃপতি লাউফলের নিকটে উপস্থিত হইল। লাউফল চিরবৈরী হাতেমকে স্বীয় করতলে পাইয়া অতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং আপন অঙ্গীকৃত পুরস্কার দিবার জন্য তাহাদিগের মধ্যে কে হাতেমকে বন্দী করিয়াছে, জানিতে চাহিলেন। তখন তাহারা প্রত্যেকেই অর্থলোভে রাজসন্নিধানে বিশেষ বীরত্ব ও চতুরতা প্রকাশ করিয়া বলিল, “আমিই দুরাত্মা হাতেমকে ধরিয়াছি।” কেবল সেই বৃদ্ধ কাঠুরিয়া কিঞ্চিৎ দূরে দণ্ডায়মান হইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছিল; সে ভাবিতেছিল, মহাত্মা হাতেম আজ

শুধু তাহারই জন্য এমন নির্দ্দয় শত্রুর হাতে পতিত হইয়াছেন।

নরপতি লাউফল ইহাদিগের প্রাগুক্ত মিথ্যা-অভিনয়ে কিছু সমস্যায় পড়িলেন। তখন পরদুঃখকাতর হাতেম বলিলেন, "মহারাজ, আপনি যদি প্রকৃত ঘটনা জানিতে চাহেন, তবে আমি বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ঐ যে অদূরে বৃদ্ধটী দণ্ডায়মান রহিয়াছে, ঐ ব্যক্তিই আমাকে এখানে আনয়ন করিয়াছে। উহাকেই আপনার প্রতিশ্রুত পুরস্কার প্রদান করুন।" লাউফল কাঠুরিয়াকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "বৃদ্ধ, যথার্থ ঘটনা কি বল। কে হাতেমকে বন্দী করিয়া আমার নিকটে আনিয়াছে?" তখন সেই সরলস্বভাব বৃদ্ধ আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলিল, "মহাত্মা হাতেম কেবল আমারই জন্য স্বেচ্ছায় এখানে আসিয়াছেন।"

নৃপতি লাউফল কাঠুরিয়ার নিকট হাতেমের এই অপূর্ব্ব মহত্ত্বের কথা শুনিয়া যারপরনাই বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলেন এবং হাতেমকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"রাজন্! আপনার কি আশ্চর্য্য বদান্যতা! আপনি পরের উপকারের জন্য নিজের জীবনের মায়াও বিসর্জ্জন দিয়াছেন! আপনার এইরূপ পরার্থ জীবনই ধন্য!" তারপর তিনি মহাত্মা হাতেমকে আলিঙ্গন করিয়া অত্যন্ত সম্মানের সহিত আপন সিংহাসন পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া পুনরায় বলিলেন, "মহাত্মন্! আমি না বুঝিয়া আপনার প্রতি অতিশয় অন্যায় আচরণ করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করুন। যিনি এরূপ ঈশ্বরপরায়ণ, যাঁহার নিমিত্ত সহস্র

সহস্র ব্যক্তি সুখী, এবং যিনি দুঃখীগণের জন্য আপন জীবনেরও মমতা করেন না, তাঁহার সহিত শত্রুভাব রাখিতে নাই। আমি আপনার অপহৃত রাজ্যসম্পদ সমস্তই প্রত্যর্পণ করিতেছি, আপনি দয়া করিয়া গ্রহণ করিলে সুখী হইব।" হাতেম উত্তর করিলেন "বন্ধু! আপনার উদারতায় আমি চরিতার্থ হইলাম।"

অতঃপর যাহারা হাতেমকে ধরিয়াছে বলিয়া মিথ্যা অহঙ্কার করিয়াছিল, লাউফল তাহাদিগকে পাঁচ শত স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিকের পরিবর্ত্তে পাঁচ শত বেত্রাঘাত করিবার আদেশ দিলেন এবং বৃদ্ধ কাঠুরিয়াকে অঙ্গীকৃত পুরস্কার প্রদান করিলেন। সকলে রাজার ন্যায়-বিচারে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল। বৃদ্ধ কাঠুরিয়া উভয় রাজাকে প্রাণ ভরিয়া ধন্যবাদ দিতে দিতে স্বগৃহে প্রস্থান করিল।

ধূলিকণা ও মেঘ।

তোমরা হয়ত জান, সমুদ্র ও ক্ষুদ্র জলাশয় প্রভৃতি হইতে জল বাষ্পাকারে আকাশে উঠে এবং তথায় ঘনীভূত হইয়া আবার বৃষ্টির আকারে পৃথিবীর উপর পতিত হয়। বৃষ্টি যদি পৃথিবীতে না পড়ে, তাহা হইলে আমাদের জীবন-ধারণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। অনাবৃষ্টি হেতু জীবজন্তু ও মানবের ঘোর কষ্ট উপস্থিত হয়। দুর্ভিক্ষে শত শত লোকের মৃত্যু ঘটে।

মেঘ হইতে বৃষ্টি পড়ে, তাহা তোমরা জান। কিন্তু মেঘের

উৎপত্তি কি প্রকারে হয়, তাহা তোমরা বোধ হয় জান না। তোমরা হয়ত দেখিয়া থাকিবে যে, যখন কোন এনজিন চলে, তখন তাহা হইতে বাষ্প বাহির হয়। ঐ বাষ্প ঊর্দ্ধদেশে গিয়া ধূসর বর্ণের মেঘের মত দেখায়। আকাশে ধূলি না থাকিলে তোমরা এই ধূসর বর্ণ দেখিতে পাইতে না। বিশুদ্ধ জলীয় বাষ্প ধূলিবিহীন স্থানে উঠিলে, তথায় ঐরূপ ধূসর বর্ণ দেখা যায় না। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, জলীয়বাষ্পকে মেঘে পরিণত হইতে হইলে, তাহাকে ধূলিকণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। বায়ুতে ধূলিকণা যত অধিক থাকিবে, মেঘ তত ঘন দেখাইবে।

রৌদ্রের উত্তাপে সমুদ্র এবং অপরাপর জলাশয়াদি হইতে জল প্রতিনিয়ত বাষ্পাকারে উড়িয়া যাইতেছে, সেই বাষ্প আকাশে উঠিয়া তথায় ধূলিকণা অবলম্বন করিয়া প্রথমে মেঘে এবং অবশেষে সুশীতল বৃষ্টিতে পরিণত হইতেছে। ধূলিকণা অল্পাধিক পরিমাণে জগতের সকল স্থানেই আছে এবং সেই জন্য মেঘও সকল স্থানে রচিত হইতে পারে। কিন্তু মেঘ একস্থানে স্থায়ীভাবে থাকে না, বায়ু-হিল্লোলে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে বৃষ্টিধারা বর্ষণ করিয়া বেড়ায়। ধূলিকণা অতি সামান্য বস্তু বটে, কিন্তু এই ধূলিকণার কৃপায় আমরা জীবন ধারণ করি। বিধাতা জগতে এইরূপ সামান্য বস্তু দ্বারা অনেক মহৎ কার্য্য ও কল্যাণ সাধন করেন।

আরকট-বিজয়ে ক্লাইব।

লর্ড ক্লাইব ভারতে ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি আরকট সমরে যে অতুলনীয় সাহস ও শৌর্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাই ভারতবর্ষে ইংরেজের ভবিষ্যৎ গৌরবের সূচনা করিয়াছিল।

আরকট কর্ণাট রাজ্যের রাজধানী। চাঁদসাহেব ও তদীয় সাহায্যকারী ফরাসীগণ কর্ত্তৃক ত্রিচিণপল্লী আক্রান্ত হইলে, মাদ্রাজের ইংরেজগণ ক্লাইবকে আরকট বিজয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

ক্লাইবের বয়স তখন পঁচিশ বৎসর, এবং তিনি তখন "কাপ্তেন" উপাধিধারী সামান্য সেনানীমাত্র। কিন্তু তাঁহার সাহস ও উৎসাহ, অবসরাভিজ্ঞতা ও নিয়ন্ত্রী-শক্তি সেই অল্প বয়সেই মাদ্রাজের ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষগণের অন্তরে বিশ্বাস ও আশা জন্মাইতে সমর্থ হইয়াছিল।

মাদ্রাজ হইতে কাপ্তেন ক্লাইব ১৭৫১ সালের ২৬শে আগষ্ট তারিখে তিন শত সিপাহী ও দুই শত ইউরোপীয় সৈন্য এবং তিনটী মাত্র কামান লইয়া আরকট অভিমুখে যাত্রা করেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার সহিত আট জন উচ্চ পদস্থ সৈনিক কর্ম্মচারী ছিলেন। কিন্তু ইহাদের কাহারও যুদ্ধ বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতা

ছিল না। তাঁহারা শুধু ক্লাইবের জ্বলন্ত উৎসাহে ও অদম্য সাহসে অনুপ্রাণিত হইয়া স্বদেশ ও স্বজাতির গৌরব রক্ষার্থ অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন।

ইহার তিন দিন পরে আরকট দুর্গবাসীরা সংবাদ পাইল, কাপ্তেন ক্লাইব দুর্জ্জয় তেজে দুর্গ অধিকার করিবার নিমিত্ত সসৈন্যে অতি নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন। দুর্গবাসীরা অস্ত্রবলে বলীয়ান ও সংখ্যায় অধিক হইলেও নিতান্ত কাপুরুষের মত প্রাণ-ভয়ে ভীত হইয়া অবিলম্বে দুর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিল। তাহার কয়েক ঘণ্টা পরেই ক্লাইব আরকট নগরে প্রবেশ করিলেন এবং অক্লেশে দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন।

এই দুর্গ বিজয়ে ক্লাইব বহু পরিমাণে পরিত্যক্ত শীসা ও বারুদ এবং আটটী পরিত্যক্ত কামান পাইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত পাঁচ লক্ষ টাকার সম্পত্তি তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল। কিন্তু এই সম্পত্তির অধিকারীগণকে তিনি উহা প্রত্যর্পণ করেন। তাঁহার এই সদাশয়তায় তাঁহার প্রতি অনেকেই অনুরক্ত হইয়াছিলেন।

দূরদর্শী ক্লাইব দুর্গাধিকার করিয়া নিশ্চিন্তে থাকিতে পারিলেন না। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, পলায়িত শত্রু-গণ অচিরে বহুবলপুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিবে, হয় ত বহুকাল তাঁহাকে আরকট দুর্গে অবরুদ্ধ থাকিতে হইবে। এজন্য তিনি দুর্গসংস্কারে ও আহার্য্যসংগ্রহে বিশেষ মনোনিবেশ করিলেন। ইতিমধ্যে চাঁদসাহেবের পুত্র রাজাসাহেব দশ সহস্র দেশীয় সৈন্য ও বহুসংখ্যক কামান লইয়া আরকট দুর্গ অবরোধ করিলেন।

দুর্জ্জয় বীর ক্লাইব কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। তিনি তাঁহার স্বল্প সৈন্য লইয়া মধ্যে মধ্যে প্রবল তেজে শত্রুসৈন্য আক্রমণপূর্ব্বক তাহাদিগকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিলেন। এবার তাহাদের মধ্যেও সাহসের অভাব ছিল না, তাহারাও বিপুল বিক্রমে ক্লাইবকে সসৈন্যে বিনষ্ট করিবার জন্য নানা উদ্যোগ ও চেষ্টা করিতে লাগিল। ক্রমে দুর্গের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল, আহার্য্যাভাবে সিপাহীরা ভাতের ফেন মাত্র খাইয়া ইউরোপীয় সৈন্যদিগকে ভাত খাইতে দিতে লাগিল। ক্লাইবের সৈন্য সংখ্যাও বহু পরিমাণে হ্রাস পাইল, দুই শত সিপাহী ও দেড়শত ইউরোপীয় সৈন্যমাত্র কার্য্যক্ষম রহিল, অবশিষ্ট আর সকলেই যুদ্ধে হত বা আহত হইয়াছিল।

এই সামান্য সৈন্য লইয়া অসমসাহসী ক্লাইব বহুবলসম্পন্ন রাজাসাহেবের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। রাজাসাহেব তাঁহাকে বাহুবলে পরাজিত কিংবা অর্থ-মোহে প্রলুব্ধ করিতে পারিলেন না। অবশেষে একদিন প্রাতঃকালে রাজাসাহেব আপনার সৈন্যগণকে চারি প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়া বিপুল বিক্রমে আরকট দুর্গ চারিদিক হইতে যুগপৎ আক্রমণ করিলেন। রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত উভয় দলে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। বন্দুক কামানের গভীর গর্জ্জনে, সৈন্যগণের বিকট নিনাদে, এবং আহতগণের আর্ত্তরবে রণস্থল কম্পিত হইতে লাগিল; রক্তস্রোতে ও মৃতদেহে রণভূমি পূর্ণ হইয়া গেল।

কিন্তু কাপ্তেন ক্লাইবের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। পঞ্চাশদিনব্যাপী এইরূপ যুদ্ধের পরে বিজয়লক্ষ্মী এই অদম্য বীরকেই বরণ

করিলেন; তাঁহার শত্রুগণ বন্দুক বারুদ প্রভৃতি ফেলিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিল।

ইহার পর ক্লাইব স্বীয় অতুল বীর্য্যবত্তার জন্য দেশে ও বিদেশে সর্ব্বত্র বিশেষ প্রতিপত্তি ও সম্মান লাভ করিলেন। তিনি আরকট-দুর্গশীর্ষে ইংরেজের যে বিজয়পতাকা উড্ডীন করিলেন, তাহার বিরাট ছায়া ক্রমে সমগ্র ভারতে প্রসারিত হইল।

মহতের বিনয়।

কুসুমের সুগন্ধ যেমন তাহার সৌন্দর্য্য শতগুণে ফুটাইয়া তুলে, তেমনি জ্ঞানী, ধনী ও ধার্ম্মিকের চরিত্রের মহত্ত্ব বিনয়ের দ্বারা বর্দ্ধিত ও প্রকাশিত হইয়া থাকে। এজন্য আমাদের দেশের একজন কবি লিখিয়াছেন—"বড় যদি হতে চাও, ছোট হও আগে।" অর্থাৎ তুমি যদি মহৎ হইতে চাও, তুমি যদি সকলের প্রিয় ও পূজনীয় হইতে চাও, তবে আগে বিনয়ী হও।

এই কবি-বাক্যের একটী সার্থক দৃষ্টান্ত আমরা বিশ্ববরেণ্য শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে পাইয়া থাকি। মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয়যজ্ঞ করিতে ইচ্ছুক হইলে ভারতের যাবতীয় রাজন্যবর্গ, ঋষিবৃন্দ ও প্রজামণ্ডলী নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এইরূপ কথিত আছে যে, সে সময়ে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের গৌরবরক্ষার্থ স্বর্গের দেবতারা পর্য্যন্ত তাঁহার যজ্ঞক্ষেত্রে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। এই মহাসমারোহ-পূর্ণ অনুষ্ঠানে যাহাতে সকল কার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে সম্পাদিত হয়, তজ্জন্য মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায় অনুসারে কুরুকুল-

পিতামহ ভীষ্মদেব, দ্রোণাচার্য্য, দুর্য্যোধন, কর্ণ, ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতি সকলেই বিভিন্ন কার্য্যের অধ্যক্ষতার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এ সময়ে একদিন মহারাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"ভাই! তুমি কোন্ কাজের ভার লইতে চাও?" তিনি বলিলেন—"আমাকে সকলের সেবার ভার দিন। যাঁহারা আপনার রাজ-সভায় প্রবেশ করিবেন, আমি তাঁহাদের পদ-ধৌত করিয়া দিব।"

যিনি জগতের শীনস্থানীয়, যাঁহার পদ-স্পর্শ করিতে পারিলে কত মুনি-ঋষি আপনাকে চরিতার্থ মনে করিতেন, তিনি স্বেচ্ছায় সকলের পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করিলেন! তাঁহার এই অতুলনীয় বিনয় ও উদারতার কথা ভাবিতে গেলে আমাদের হৃদয় স্বভাবতঃই তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে অবনত হইয়া পড়ে!

শ্রীকৃষ্ণের এই অপূর্ব্ব আচরণ বহুদর্শী ভীষ্মের অন্তর বিশেষভাবে স্পর্শ করিল। গুণী গুণীর গুণ না বুঝিলে আর কে বুঝিবে? ভীষ্মদেবের প্রতি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচারের ভার অর্পিত ছিল। যথাবিধানে রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, মহারাজ যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সমবেত বিপুল জনসঙ্ঘের মধ্যে কে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—কে সর্ব্বাগ্রে অর্চ্চিত হইবার যোগ্য?" তখন কুরুকুলপিতামহ অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিলেন, "মহারাজ! বিনয়ের অবতার সর্ব্বগুণসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণই এই বিশাল জনমণ্ডলীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহাকেই সর্ব্বাগ্রে অর্ঘ্য প্রদান করুন।"

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশে সহদেব শ্রীকৃষ্ণের পাদবন্দনা করিয়া ধন্য হইলেন। সহস্র সহস্র রাজচক্রবর্ত্তীর মধ্যে, সহস্র সহস্র যোগীঋষির মধ্যে, সকলের পরিচারক বিনয়ী শ্রীকৃষ্ণের স্থান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্ণীত হইল।

আমরা বুঝিতে পারিলাম, যিনি বাস্তবিক মহৎ, তিনি কখনও কোন কর্ত্তব্য কার্য্যকে হেয় বলিয়া বিবেচনা করেন না, এবং তিনি যে কাজে নিযুক্ত হন, তাহা সাধারণের চক্ষে যতই ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ হউক না কেন, কিছুতেই তাঁহার মহত্ত্ব ও তাঁহার গৌরব বিন্দুমাত্র খর্ব্ব করিতে পারে না।

রাবণের উপদেশ।

ত্রিলোকবিজয়ী লঙ্কেশ্বর রাবণ মহাযুদ্ধে আহত হইয়া পতিত হইলে দশরথাত্মজ রামচন্দ্র কনিষ্ঠ লক্ষ্মণের সহিত তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া শ্রদ্ধাবিনম্রহৃদয়ে কিছু উপদেশ শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মুহূর্ত্তে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী বীরদ্বয়ের মধ্যে জেতা-বিজেতার সকল ব্যবধান ঘুচিয়া গেল। রাক্ষসরাজ রাবণ যে স্ত্রী-অপহরণকারী পরম শত্রু, তাহা মহাপ্রাণ রামচন্দ্র বিস্মৃত হইলেন; পক্ষান্তরে রাম যে "এক লক্ষ পুত্র আর সওয়া লক্ষ নাতি"র নিধনকর্ত্তা ও নিজের এই শোচনীয় অবস্থার কারণ, তাহাও উদারচেতা মুমূর্ষু রাবণ ভুলিয়া গেলেন। ভীষণ রণক্ষেত্র যেন অকস্মাৎ প্রীতি, ক্ষমা ও করুণার পবিত্র পীঠভূমিতে পরিণত হইল।

অমিতপরাক্রমশালী রাবণ আপনার অসীম মৃত্যু-যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করিয়া হাস্য-মুখে রামচন্দ্রকে অভিবাদনপূর্ব্বক বলিলেন, "বন্ধু, আমার জীবন সংশয়; বেশী কথা বলিবার সাধ্য নাই,—আপনাকে উপদেশ দিবার ক্ষমতাও আমার নাই; তথাপি আপনি যখন আদেশ করিতেছেন, তখন আমি দুই একটী কথা বলিব, আপনি অনুগ্রহ করিয়া শ্রবণ করুন।

"যখন কোন উত্তম কার্য্য করিবার ইচ্ছা হইবে, আলস্য ত্যাগ করিয়া তখনি তাহা সম্পাদন করিবেন। কোন সৎকার্য্য ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দিলে, তাহা পুনরায় সম্পন্ন হওয়া দুষ্কর।

"কিন্তু যদি কখনও কোন দুষ্কর্ম্ম করিবার অভিলাষ অন্তরে জাগে, তাহা কদাপি তৎক্ষণাৎ সম্পাদন করিবেন না। সেই কার্য্যের শুভাশুভ ফলাফল বিশেষ বিবেচনার সহিত পূর্ব্বে চিন্তা করিয়া দেখিবেন, যেন তাহার জন্য পশ্চাৎ অনুতাপ করিতে না হয়।

"রঘুনাথ! আমি নিজের জীবনেই এই দুইটী বিষয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। সুদীর্ঘ জীবন ও অসীম ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াও একমাত্র দীর্ঘসূত্রতার জন্য আমার কয়েকটী উত্তম আকাঙ্ক্ষা এ জন্মে আর পূর্ণ হইল না। অথচ আমি হিতাহিত বিচার না করিয়া কুকার্য্য করায় সবংশে ধ্বংস প্রাপ্ত হইলাম।

"একদিন পাতকীদিগের কষ্ট দেখিয়া আমার ইচ্ছা হইয়া-ছিল, নরককুণ্ডগুলি সম্পূর্ণ ভরাট করাইয়া দিব; তাহা হইলে

আর তাহাদিগকে সেই পূতিগন্ধময় অন্ধকার স্থানে অসহ্য দুর্গতি ভোগ করিতে হইবে না। কিন্তু আজি কালি করিয়া আমার সে ইচ্ছা আর সফল হইল না। হয়ত আজ আমি তাহাদের কষ্টের সমাংশভাগী হইতে চলিলাম!

"আর একদিন আমার মনে হইয়াছিল, এই স্বর্ণলঙ্কা লবণাক্ত সমুদ্রে পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে। সমস্ত স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল আমার করতলগত, আমি কেন এই লবণ সমুদ্রের মধ্যে অবস্থান করিব? আমি লবণ সমুদ্রের সমস্ত জল সিঞ্চন করাইয়া ফেলিয়া এখানে ক্ষীরোদ-সাগর আনিয়া রাখিব। এ কথা চিরকাল আমার মনে আছে; কিন্তু আজকাল করিব করিব করিয়া এ জন্মে আমার এ সাধ পূর্ণ হইল না। আমার মনের ইচ্ছা মনেই রহিয়া গেল।

"তারপর আর একদিন আমি ভাবিয়াছিলাম, সকলেই দেবলোকে যাইতে ইচ্ছা করে; কিন্তু সুকৃতি কিংবা দৈবশক্তি ভিন্ন কেহই সেই অমরবাঞ্ছিত স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। অতি অল্প জীবেরই এ সৌভাগ্য ঘটিয়া থাকে। এজন্য আমার ইচ্ছা হইয়াছিল, আমি বিশ্বকর্ম্মাকে দিয়া পৃথিবী হইতে স্বর্গ পর্য্যন্ত এমন এক বিচিত্র সোপান নির্ম্মাণ করাইয়া দিব, যাহাতে প্রাণীনির্ব্বিশেষে সকলেই এই স্বর্গের সিঁড়ি বাহিয়া অক্লেশে স্বর্গে আরোহণ করিতে পারিবে। আমি যদি ইচ্ছামাত্রই এ বিষয়ে মনোযোগী হইতাম, তবে এতদিনে কোন্ কালে আমার কার্য্যসিদ্ধি হইয়া যাইত এবং এ সংসারে আমার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি ও অক্ষয় যশ ঘোষিত হইত। কিন্তু আজি কালি করিয়া হেলায়

হেলায় আর এ জীবনে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। শুভকার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন না করিলে তাহা চিরকাল এমনি অসম্পন্ন থাকিয়া যায়।

"পক্ষান্তরে, আপনার সতীসাধ্বী সহধর্ম্মিণী সীতাকে হরণ করিয়া আনিতে আমি কিছুমাত্র কালবিলম্ব করি নাই! তখন যেন অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিবারও আমার সময় ছিল না! সেই পাপের ফলে আমার সোণার লঙ্কা ছারখার হইয়া গেল এবং পরিশেষে আমি নিজেও বিনষ্ট হইলাম। পূর্ব্বে সবিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলে আমি কখনও সীতাকে হরণ করিতাম না এবং আমারও আজ এ দুর্দ্দশা হইত না।"

সেবা-নিষ্ঠা।

কত যুগযুগান্তর গত হইয়াছে, সুনিবিড় দণ্ডকারণ্যে পম্পা-সরোবরের নিকটে মহর্ষি মাতঙ্গ ও ঋষীশ্বর আশ্রম রচনা করিয়া সশিষ্য বাস করিতেন। তাঁহারা প্রতিদিন প্রভাতে যখন পম্পায় অবগাহন করিতে যাইতেন, তখন দেখিতে পাইতেন, কে যেন গভীর নিশীথে আসিয়া, পাছে ঋষিদের পদে কণ্টক বিদ্ধ হয়, সে জন্য দুর্গম গহন পথ সম্মার্জ্জনী দিয়া সযত্নে পরিষ্কার করিয়া গিয়াছে। কে যেন পুঞ্জ পুঞ্জ সমিধ আহরণ করিয়া তাঁহাদের যজ্ঞ-গৃহের দ্বারে রাখিয়া গিয়াছে। কে যেন বিকশিত ফুলে ফলে অর্ঘ্যরাজি সাজাইয়া রাখিয়াছে!

ঋষিগণ বিস্মিত হইয়া ভাবিতেন, কে এমন সহৃদয় মহাত্মা,

যিনি রজনীর গাঢ় অন্ধকারে আত্ম-গোপন করিয়া এবং নিজের সুপ্তি, ক্লান্তি ও মৃত্যু ভয় ভুলিয়া এই গভীর অরণ্যে এমন নিষ্কামভাবে প্রতিদিন তাঁহাদের সেবা করিতেছেন ?

এ রহস্য উদ্ঘাটন করিবার জন্য একদিন মাতঙ্গ ঋষির শিষ্যগণ পরামর্শ করিয়া পথপার্শ্বে নানাস্থানে ঘন বন-অন্তরালে লুকাইয়া রহিলেন। রাত্রি যখন দ্বিপ্রহর, তখন তাঁহারা অকস্মাৎ শুষ্ক স্খলিত পত্রের মর্ম্মর-শব্দে চকিত হইয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন, অপচ্ছায়ার মত কে তাঁহাদের সম্মুখের বনবীথিখানি পরিষ্কার করিতেছে। তাঁহারা অন্ধকারে তাহাকে চিনিতে না পারিয়া সঙ্গে লইয়া আশ্রমে ফিরিলেন।

মহর্ষি মাতঙ্গ ও ঋষীশ্বর তখনও সদালাপে নিমগ্ন ছিলেন। শিষ্যগণ সেখানে উপনীত হইয়া উজ্জ্বল দীপালোকে দেখিতে পাইলেন, তাঁহারা যাহাকে ধরিয়া আনিয়াছেন, সে আর কেহই নহে, ব্যাধবালা কুমারী শবরী! সে এতকাল ধরিয়া কি অপূর্ব্ব ভক্তির আবেগে প্রত্যহ নিশাকালে অলক্ষিতে তাঁহাদের সেবা করিয়া আসিতেছে। কত বর্ষার অজস্র বারিধারা, কত শিশিরের তীব্র শীত, কিছুতেই তাহার পুণ্য-ব্রত উদ্যাপনে বাধা দিতে পারে নাই—কিছুতেই তাহাকে সঙ্কল্প-চ্যুত করিতে পারে নাই!

শবরী ধরা পড়িয়া অধোমুখে কাঁদিতেছিল, যেন সে ঋষিদের সেবা করিয়া অজ্ঞাতে কি ভয়ঙ্কর অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছে। ঋষি ঋষীশ্বর চিন্তা করিলেন, 'আমরা এতকাল না জানিয়া অস্পৃশ্যা ব্যাধকন্যার প্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া

মহাপাতকী হইয়াছি, সে জন্য এখন তাহাকে কিরূপ শাস্তি দেওয়া উচিত।'

মহর্ষি মাতঙ্গ অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন। তিনি শবরীর নির্ম্মল হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া তাহাকে সস্নেহে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "আমি তোমার নিষ্কাম সেবানিষ্ঠায় অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছি। আমি তোমাকে আমার কন্যারূপে গ্রহণ করিলাম। আজ হইতে তুমি আমার এই আশ্রমেই বাস করিবে।"

নীচজাতীয়া চণ্ডালবালিকার প্রতি আর্য্য-ঋষি মাতঙ্গের এতটা অযাচিত অনুগ্রহ দেখিয়া জাতিমর্য্যাদা-গর্ব্বী ঋষীশ্বর অতিশয় বিস্মিত ও কুপিত হইলেন এবং মাতঙ্গকে কঠোর ভর্ৎসনা করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। আমরা অনেক সময়ে অনেকের সেবা গ্রহণ করি, কিন্তু তাহাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিতে হইলে এমনিভাবে কুণ্ঠিত হইয়া থাকি।

উদার-হৃদয় মহর্ষি মাতঙ্গ ঈষৎ হাসিয়া শবরীর দুইখানি হাত ধরিয়া বলিলেন, "মা! তুমি কেন বৃথা সঙ্কোচ ও দ্বিধা বোধ করিতেছ? উচ্চকুল কিংবা ধনৈশ্বর্য্য কখনও কাহাকেও প্রকৃত মনুষ্যত্ব দান করিতে পারে না, তাহা ঐকান্তিক সাধনার দ্বারাই লাভ করিতে হয়। তোমার ন্যায় সেবাপরায়ণা পুণ্যবতী নারীর তাহা অপ্রাপ্য নহে।"

শোকে শান্তি।

একদিন বুদ্ধদেব সমবেত জনসঙ্ঘকে জগতের দুঃখতাপহারী অমৃতময় উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন, এমন সময় অকস্মাৎ অদূরে করুণ আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইয়া সকলে চাহিয়া দেখিল, পুত্র-হারা কিশা গোতমী মৃত পুত্রকে বক্ষোপরে রাখিয়া উন্মাদিনীর মত বৈশাখী ঝড়ের ন্যায় বেগে ছুটিয়া আসিতেছে। সকলে ত্রস্ত হইয়া তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিল।

ভক্ত যেমন ভগবানের পদে অঞ্জলি সমর্পণ করে, সেইরূপ কিশা গোতমী তাহার মৃত-সন্তানকে বুদ্ধদেবের শ্রীচরণে রাখিয়া যুক্তকরে বলিল, "প্রভু, আমি শুনিয়াছি, আপনি বিশ্বকে মুক্তি দিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আজ আমার এই প্রাণের সন্তানকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া নিদারুণ শোকের হস্ত হইতে আমাকে মুক্তিদান করুন। নতুবা আমি উদ্বন্ধনে দেহ ত্যাগ করিয়া ইহার অনুগামিনী হইব।"

করুণাময় বুদ্ধদেব কত ভাবে তাহাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু কিছুতেই তাহার শোক-সন্তপ্ত প্রাণ শীতল হইল না। সে পুনঃ পুনঃ তাঁহার নিকটে একান্ত কাতরভাবে সন্তানের জীবন ভিক্ষা করিতে লাগিল।

তখন অগত্যা বুদ্ধদেব শোকাতুরা কিশা গোতমীকে বলিলেন, "তুমি যদি আমাকে কয়েকটী শস্য আনিয়া দাও, তবে

আমি তোমার মৃত-পুত্রের প্রাণ দান করিতে পারি। কিন্তু তোমাকে এমন গৃহ হইতে শস্যগুলি আনিতে হইবে, যে গৃহে কেহ কখনও মৃত্যু-মুখে পতিত হয় নাই।"

স্নেহমুগ্ধ মাতৃহৃদয় আশা ও আনন্দে নাচিয়া উঠিল। শোক-দগ্ধ মর্ত্ত্যলোকে তেমন মৃত্যুহীন গৃহ আদৌ সম্ভব কি না, কিশা গোতমী একবারও ভাবিয়া দেখিল না। সে মৃত-সন্তানকে বুদ্ধদেবের নিকটে রাখিয়া শস্যের অন্বেষণে নগরাভিমুখে ছুটিয়া চলিল।

বিশাল নগরী তন্ন তন্ন করিয়া প্রত্যেক গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে কয়েকটী শস্য ভিক্ষা চাহিয়া কিশা গোতমী ফিরিতে লাগিল। পুরাঙ্গনাগণ পুঞ্জ পুঞ্জ শস্য ভিক্ষা দিতে আসিয়া যখন শুনিলেন, সে এমন গৃহস্থের শস্য চায়, যাহার গৃহে কেহ কখনও মরে নাই—কেহ কখনও দুঃখ-শোকের আঘাত লাভ করে নাই, তখন সকলেই তাহাকে নিজ নিজ দুঃখ-শোকের কথা জানাইয়া শস্য ভিক্ষা দিতে ক্ষান্ত হইলেন।

সারাদিন এইরূপ ব্যর্থ অনুসন্ধানে কিশা গোতমী বুঝিতে পারিল, এ সংসারে তেমন আনন্দপূর্ণ মৃত্যুহীন গৃহ একটীও নাই। সে শুধু একেলা শোকাতুরা নহে—সে শুধু একেলা আপনার প্রাণাধিক সন্তানকে হারায় নাই! মৃত্যুর করাল স্পর্শ প্রত্যেক গৃহেই পতিত হইয়াছে। জগতের অসংখ্য নরনারী কেহ পিতা, কেহ মাতা, কেহ ভাই, কেহ ভগ্নী, কেহ পত্নী, কেহ পুত্র-কন্যা হারাইয়া প্রতিনিয়ত হাহাকার করিতেছে! জগতের এত দুঃখ-দৈন্য শোক-বেদনা দেখিয়া কিশা গোতমী

নিজের অসহ্য কষ্টের কথা ভুলিয়া গেল—তাহার শোক-সন্তপ্ত প্রাণে ধীরে ধীরে আবার শান্তি ফিরিয়া আসিল।

সে তখন বুদ্ধদেবের নিকটে উপনীত হইয়া তাঁহার পদ-বন্দনা পূর্ব্বক বলিল, "ভগবন্! আমার ভ্রান্তি ঘুচিয়াছে। আমি আর মৃত-পুত্রের প্রাণ-দান চাহি না। আমি বিশ্ব-শোকে নিজের ক্ষুদ্র শোকের কথা ভুলিয়াছি। পৃথিবীর এ শোক আমি যাহাতে কথঞ্চিৎ নিবারণ করিতে পারি—আমি যাহাতে অন্তিমে শাশ্বত নির্ব্বাণের অধিকারিণী হইতে পারি, আপনি করুণা করিয়া তাহার উপদেশ আমাকে দিন।"

নির্ভরের জয়।

একদা সন্ধ্যাবেলা তাপস-শ্রেষ্ঠ হমজা খোরসানী এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরের উপর দিয়া সুমধুর কণ্ঠে ঈশ্বরের গুণ গান করিতে করিতে চলিয়াছিলেন। তাঁহার মনে মনে এই সঙ্কল্প ছিল, যদি প্রাণ যায় তাহাতেও স্বীকৃত আছেন, তথাপি তিনি কাহারও নিকটে কিছু যাচ্ঞা করিবেন না।

এমন সময় হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, তাঁহার স্নেহশীলা ভগ্নী তাঁহার পাথেয়ের জন্য কয়েকটী রৌপ্যমুদ্রা তাঁহার উত্তরীয়প্রান্তে বাঁধিয়া দিয়াছে। তিনি ভাবিলেন, 'আমার এই রৌপ্যমুদ্রার কোন প্রয়োজন নাই। যিনি এই বিশাল পৃথিবী রক্ষা করিতে-ছেন, তিনি আমার ন্যায় দীনহীনকে অবশ্যই রক্ষা করিবেন।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ রৌপ্যমুদ্রাগুলি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

তারপর আবার, অনন্ত আকাশ-পথে আপনার প্রাণের আনন্দে গান গাহিতে গাহিতে মুক্ত বিহঙ্গম যেমন ছুটিয়া যায়, তেমনি সকলবন্ধনহীন ভক্ত মুসলমানসাধু হমজা খোরসানী আপন প্রাণের আনন্দে মধুর সঙ্গীতে দশদিক মুখরিত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

তিনি তখন আপন ভাবে আপনি এতই আত্মহারা হইয়া-ছিলেন যে, পথের মধ্যস্থলে যে একটী শুষ্ক কূপ ছিল, তিনি তাহা লক্ষ্য করিতে না পারিয়া অকস্মাৎ তাহাতে পতিত হইলেন।

কূপটী তেমন বেশী গভীর ছিল না, তিনি ইচ্ছা করিলেই তাহা হইতে অনায়াসে উপরে উঠিতে পারিতেন। কিন্তু ভক্ত হমজা ভাবিলেন, 'যিনি আমাকে এখানে ফেলিয়াছেন, তিনিই আমাকে উপরে তুলিবেন। আমি কখনও নিজে চেষ্টা করিয়া উপরে উঠিব না।'

এইরূপে প্রহরের পর প্রহর অতীত হইতে লাগিল। রজনীর নিবিড় অন্ধকার চারিদিক ঘিরিয়া ফেলিল। সেই নীরব স্তব্ধতার ভিতরে শুধু একবার ঝিল্লীর মৃদু তান ভাসিয়া আসিতে লাগিল। তাপসের হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল, তিনি হৃদয়কে 'শান্ত হও' 'শান্ত হও' বলিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

এমন সময় আর একজন পথিক সে পথে অগ্রসর হইয়া সেই কূপটী দেখিতে পাইল। কিন্তু সে হমজা খোরসানীকে দেখিতে না পাইয়া, পাছে কাহারও সেখানে পদস্খলন হয়, এই আশঙ্কা করিয়া কতকগুলি পল্লব দ্বারা কূপের মুখ আবৃত করিয়া দিল।

এদিকে হমজা খোরসানীর নিশ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। তিনি একবার কাতর হইয়া ভাবিলেন, 'হজরত মোহাম্মদ বলিয়াছেন, "কখনও স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করিও না।" আমি কেন তবে আজ ইচ্ছা করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে বসিয়াছি?' কিন্তু তখনি আবার তিনি নিজের দুর্ব্বলতাকে ধিক্কার দিয়া চিন্তা করিলেন, 'আমি কখনও আমার নির্ভরতাকে নষ্ট হইতে দিব না। যাঁহার অপার করুণা কূপ-কূলে সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করিয়াছে, তিনি নিশ্চয়ই কূপের ভিতরেও আমাকে রক্ষা করিবেন।'

ক্রমে হমজা খোরসানীর হৃদয়ের স্পন্দন থামিয়া আসিতে লাগিল, তাঁহার নিশ্বাস ধীরে প্রবাহিত হইতে লাগিল, তথাপি তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না, বিশ্বাসোন্নত মস্তকে হিমাদ্রির ন্যায় অটল অচল রহিলেন।

পরমেশ্বরের কি আশ্চর্য্য মহিমা! তাঁহার কোন ভক্ত সন্তান তাঁহার অসীম করুণায় নির্ভর করিয়া নিরাশ্রয়ভাবে প্রাণত্যাগ করিবেন, ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না। তাই হঠাৎ কোথা হইতে একটী ভয়ঙ্কর শার্দ্দূল সেখানে উপস্থিত হইল এবং পদদ্বারা কূপের উপরিস্থিত জঞ্জালরাশি সরাইয়া হমজা খোরসানীকে উপরে উঠাইল। তাপসবর সেই মুহূর্ত্তে আপন অন্তরে এই অপূর্ব্ব দৈব-বাণী শ্রবণ করিলেন,—"হে আমার প্রিয় সন্তান! তুমি যখন আমার প্রতি পূর্ণ নির্ভর স্থাপন করিলে, তখন যে ভীষণ রক্ত-পিপাসু জীবের দ্বারা তোমার জীবনের আশঙ্কা ছিল, তাহাকে দিয়াই তোমার জীবন রক্ষা করিলাম।"

আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত।

শিকারে উন্মত্ত মহারাণা প্রতাপসিংহ একটী ধাবমান বন্য-বরাহকে লক্ষ্য করিয়া হস্তস্থিত ভীষণ শল্য নিক্ষেপ করিলেন। দৈববশে ঠিক সেই সময়েই তাঁহার অনুজ আজন্ম-তেজস্বী শক্তসিংহও সেই বরাহ লক্ষ্য করিয়া একটী শল্য-ত্যাগ করিলেন। উভয় ভ্রাতা কর্ত্তৃক যুগপৎ আহত হইয়া হতভাগ্য বরাহ ভূপতিত হইল।

কিন্তু প্রতাপসিংহ ও শক্তসিংহের মধ্যে কোন কালে সদ্ভাব ছিল না। এক্ষণে কনিষ্ঠকে স্বীয় গৌরবের সমাংশভাগী হইতে দেখিয়া মহারাণা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং উন্মুক্ত-অসি হস্তে তাঁহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়া কঠোর স্বরে বলিলেন, "এস, দেখি কাহার লক্ষ্য অব্যর্থ!"

শক্তসিংহও প্রস্তুত ছিলেন, তিনি দ্বিগুণ আক্রোশে অগ্রজের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে অগ্রসর হইলেন।

ভ্রাতৃযুগল ক্রোধান্ধ হইয়া স্বাভাবিক স্নেহমমতা বিসর্জ্জন দিলেও বীর-সুলভ সৌজন্য বিস্মৃত হইলেন না। শক্তসিংহ আপনার অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া অগ্রজের পাদবন্দনা করিলেন, প্রতাপসিংহও তাঁহাকে "জয়ী হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তারপর শক্তসিংহ পুনরায় অশ্বারোহণ করিলে, উভয়ে যুদ্ধার্থে উদ্যত হইয়া অসিহস্তে পরস্পরের সম্মুখীন হইলেন।

এমন সময় অকস্মাৎ তাঁহাদের চিরহিতৈষী কুলপুরোহিত দ্রুতপদে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাদের উভয়ের মধ্যস্থলে উভয় বাহু প্রসারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং উভয়কে সম্বোধন করিয়া সস্নেহে বলিলেন, "বৎসগণ! এই ঘৃণিত ভ্রাতৃদ্রোহিতা হইতে নিরস্ত হও। পরস্পর ভ্রাতৃ-বিরোধ করিয়া মহামতি বাপ্পারাওর পবিত্র বংশ কলঙ্কিত করিও না। সাবধান! ভ্রাতার রক্তে যেন ভ্রাতার অস্ত্র অপবিত্র না হয়!"

কিন্তু মানুষ ক্রোধপরবশ হইলে তাহার আর হিতাহিত বিচার করিবার ক্ষমতা থাকে না। যুদ্ধোন্মুখ ক্রোধান্ধ ভ্রাতৃদ্বয়ও কল্যাণ-কামী পুরোহিতের হিত-বাণীতে কর্ণপাত করিলেন না। তখন এই সর্ব্বনাশকর ভ্রাতৃদ্রোহিতা হইতে তাঁহাদিগকে কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত করিতে সমর্থ না হইয়া, সমস্ত রাজপুত-জাতির পরম শুভানুধ্যায়ী সেই উদার-হৃদয় কুল-পুরোহিত নিমেষমধ্যে এক ক্ষুদ্র তরবারী বাহির করিয়া আপনার বক্ষস্থলে সজোরে বিদ্ধ করিলেন। প্রবলবেগে উত্তপ্ত শোণিতস্রোত প্রবাহিত হইয়া মহারাণা প্রতাপসিংহ ও শক্তসিংহের দেহ স্পর্শ করিল। উভয় ভ্রাতা এই আকস্মিক মর্ম্মান্তিক ঘটনায় যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন।

যিনি অন্যের মঙ্গলার্থ এ ভাবে অম্লান বদনে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করিতে পারেন, তাঁহার জীবন শত ধন্য! কালের অক্ষয়-পটে তাঁহার নাম জলদাক্ষরে লিখিত ও পূজিত হইয়া থাকে।

বালকের বীরত্ব।

আজ তোমাদিগকে দুইজন বীর-বালকের কথা বলিব। ইহাদের একজন আমাদের দেশে ও অন্যজন সুদূর ফ্রান্সে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে একজনের চরিত্রে আশ্চর্য্য পিতৃভক্তি ও তেজস্বিতা, এবং অন্য জনের চরিত্রে অসাধারণ মাতৃভক্তি ও সত্যবাদিতার পরিচয় পাওয়া যায়। উভয়েরই সাহস অতুলনীয়।

(১)

১৭৪০ খৃষ্টাব্দে, মুর্শিদাবাদের সুবিশাল গিরিয়া প্রান্তরে বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার সিংহাসন লইয়া নবাব সরফরাজ খাঁর সহিত তদীয় অনুচর আলিবর্দ্দী খাঁর তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে। যুগপৎ সহস্র সহস্র বন্দুক কামান গর্জ্জন করিয়া উঠিতেছে, সহস্র সহস্র গুলি গোলা চতুর্দ্দিকে ছুটিতেছে, সহস্র সহস্র আহত ও মুমূর্ষু সৈনিকবৃন্দের আর্ত্তনাদে রণাঙ্গন পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, আবার তখনি সমরোন্মত্ত সহস্র সহস্র বীরের ভীষণ সিংহনাদ যুগপৎ মিলিত হইয়া সমরক্ষেত্রের সকল কোলাহলকে পরাজিত করিয়া অনন্ত আকাশে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

নবাব সরফরাজ খাঁ স্বয়ং আপনার সৈন্যের পরিচালনা করিতে-ছিলেন। তিনি একটী বিরাটকায় রণ-মাতঙ্গের উপরে আরূঢ় ছিলেন। অকস্মাৎ আলিবর্দ্দীর সৈন্য হইতে একটী বিষাক্ত তীর

আসিয়া তাঁহার ললাটে বিদ্ধ হইল। তিনি মুহূর্ত্তে প্রাণ হারাইয়া হাওদার মধ্যে লুটাইলেন।

নবাবের সৈন্য-শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু এমন সময় তাঁহার জনৈক রাজপুত সেনানী বিজয়সিংহ আলিবর্দ্দীর সৈন্য-দলকে মথিত ও সন্ত্রস্ত করিয়া তীব্র তেজে অগ্রসর হইলেন। নবাব নিহত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু এখনও তো তাঁহার নিজের শরীরে প্রাণ আছে—হৃদয়ে বীর্য্য আছে! তিনি রাজপুত হইয়া কিরূপে শত্রুকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিবেন?

মহাবীর বিজয় সিংহকে বাধা দিবার কাহারও সাধ্য ছিল না, তাঁহার শাণিত কৃপাণ মুহুর্মুহুঃ শত্রু-শোণিতে রঞ্জিত হইতেছিল। সহসা তিনি আলিবর্দ্দী খাঁকে সম্মুখে দেখিতে পাইলেন, তাঁহার বীর-হৃদয় দারুণ বিজিগীষায় নাচিয়া উঠিল, তিনি আলিবর্দ্দীর বক্ষস্থল লক্ষ্য করিয়া হস্তস্থিত ভল্ল সজোরে নিক্ষেপ করিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ আলিবর্দ্দীর সর্ব্বাঙ্গ লৌহবর্ম্মে আবৃত থাকায় বিজয়সিংহের সুতীক্ষ্ণ ভল্ল তাহাতে প্রতিহত হইল।

এমন সময় অকস্মাৎ একটী জ্বলন্ত গোলা আসিয়া কাল-দণ্ডের ন্যায় বিজয়সিংহের মস্তকে আঘাত করিল। তিনি স্বীয় ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া বীর-শয্যা গ্রহণ করিলেন। বন্ধনোন্মুক্ত বন্যার স্রোতের মত আলিবর্দ্দীর সৈন্যগণ বিজয়সিংহের সেই মৃতদেহ পদ-দলিত করিয়া অগ্রসর হইতে উদ্যত হইল।

বিজয়সিংহের নবম-বর্ষীয় বীর পুত্র জালিমসিংহ এতক্ষণ বীর-পিতার পার্শ্বে থাকিয়া যুদ্ধ করিয়া আসিতেছিল। এক্ষণে সে পিতার পবিত্র শরীরের অবমাননার সম্ভাবনা দেখিয়া তাহার

ক্ষুদ্র অসি ঘুরাইয়া সরোষে গর্জ্জন করিয়া বলিল,—"সাবধান! কেহ আমার পিতার শরীর স্পর্শ করিলে প্রাণ হারাইবে।"

ক্ষুদ্র বালকের এই অসীম সাহস ও আশ্চর্য্য পিতৃভক্তি দেখিয়া আলিবর্দ্দীর সৈন্যগণ নিমেষের জন্য বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। তারপর আবার যখন তাহারা অগ্রসর হইতে গেল, তখন উদারহৃদয় আলিবর্দ্দী খাঁ তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"সৈন্যগণ! ক্ষান্ত হও! যুদ্ধ সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে! এই ক্ষুদ্র শিশু জালিমসিংহ বীরের শ্রেষ্ঠ বীর! তোমরা সকলে ইহার নামে জয়ধ্বনি কর!"

বীরেই বীরের যথার্থ সম্মান করিতে জানেন। বিপুল জয়োল্লাসের ভিতরে মুহূর্ত্তমধ্যে বিজয়ী আলিবর্দ্দী খাঁর একজন উচ্চপদস্থ সৈনিকপুরুষ জালিমসিংহকে সগৌরবে কোলে তুলিয়া লইলেন।

(২)

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে ভয়ঙ্কর অন্তর্বিদ্রোহ চলিতেছিল। ফরাসী দেশে রাজা নাই, সেখানে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত; অর্থাৎ সেখানকার অধিবাসীগণ আপনাদিগের মধ্য হইতেই কয়েকজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিয়া তাঁহাদিগের সাহায্যে আপনাদের দেশ আপনারাই শাসন ও রক্ষণ করিয়া থাকেন। কতকগুলি লোক এই সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল।

একদা সাধারণতন্ত্রের একজন সেনাপতি কতিপয় বিদ্রোহীকে

পরাজিত করিয়া বন্দী করিলে, ফরাসী-গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে গুলি করিয়া বধ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন।

সেনাপতি সেই আদেশ প্রতিপালন করিতেছিলেন। হতভাগ্যগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেনাপতির ইঙ্গিত-মাত্র তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যগণ বন্দীদিগের একজনের পর এক-জনকে হত্যা করিতেছিল।

এমন সময় দেখা গেল, তাহাদিগের মধ্যে একটী সুকুমার-মূর্ত্তি পঞ্চদশবর্ষীয় বালক রহিয়াছে। সে যেন মৃত্যুকে কিছু-মাত্র গ্রাহ্য করে না, সম্মুখের ভীষণ দৃশ্যে সে যেন কিছু-মাত্র ভীত নহে, সে একান্ত নিরুদ্বেগচিত্তে দাঁড়াইয়া বীরের মত স্থির-ধীরভাবে আপনার শেষমুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতেছে।

বন্দীর দলে সেই বালকের মত অল্পবয়স্ক আর কেহ ছিল না। তাহার সরলতামাখা সুন্দর মুখের প্রতি চাহিয়া সেনাপতির কঠোর প্রাণেও স্নেহ ও দয়ার উদয় হইল। তাই তিনি তাহাকে মুক্তি দিতে ইচ্ছা করিয়া পরীক্ষাচ্ছলে বলিলেন, "বালক! এবার তোমাকে গুলি করা হইবে, তুমি কি বল?"

সেনাপতিকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া নির্ভীক বালক তেমনি প্রশান্তভাবে সুস্পষ্ট কণ্ঠে উত্তর দিল, "আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত আছি, আমাকে গুলি করিতে অনুমতি প্রদান করুন।"

সেনাপতি মহোদয় বালকের এই বীরোচিত উত্তরে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহাকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, এই বীর বালকের নাম ভিক্টর; পীড়িতা বৃদ্ধা জননী ব্যতীত এ সংসারে তাহার আর কেহ নাই। সেনাপতি মহাশয় যদি

একটী ঘণ্টার জন্য তাহাকে ছুটি দেন, তবে সে তাহার অসুস্থ মাতাকে একবার দেখিয়া আসিতে পারে।

সেনাপতি তখন কৌতূহলী হইয়া বলিলেন, "ভিক্টর! তোমাকে ছাড়িয়া দিলে তুমি যে আবার এখানে ফিরিয়া আসিবে, তাহার প্রমাণ কি?" ভিক্টর সতেজে বলিল, "আমি যে আপনাকে কথা দিয়া যাইতেছি! সত্য কথা অপেক্ষা আমার জীবনের মূল্য তো বেশী নয়!" সেনাপতির ইচ্ছা হইল, তাহাকে একবার সস্নেহে বুকে জড়াইয়া ধরেন; কিন্তু অতি কষ্টে সে ভাব গোপন করিয়া তিনি এক ঘণ্টার জন্য ভিক্টরকে ছুটি দিলেন।

ভিক্টর প্রাণপণে ছুটিয়া অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই পীড়িতা জননীর নিকটে উপস্থিত হইল। সে একেবারে মুক্তি পাইয়াছে মনে করিয়া তাহার স্নেহময়ী জননী তাহাকে বক্ষে ধরিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই সুখ-স্বপ্ন ভঙ্গ করিলে তিনি অন্তরে অতিশয় ব্যথা পাইবেন, সেজন্য ভিক্টর তাঁহাকে আর কিছু বলিল না।

অকস্মাৎ এইরূপ আশাতীত আনন্দোচ্ছ্বাসে ভিক্টরের অসুস্থা জননী অত্যল্পকাল মধ্যেই অত্যন্ত পরিশ্রান্তা হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। ভিক্টর বুঝিতে পারিয়াছিল, জননী জাগরিতা হইলে তাঁহার নিকটে বিদায় লওয়া কষ্টকর হইবে; তাই সে এই সুযোগে আবার ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া সেনাপতির নিকটে উপনীত হইল।

সেনাপতি মহাশয় তাহাকে এক ঘণ্টার অনেক পূর্ব্বেই ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। কিন্তু

তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার অবসর না দিয়া ভিক্টর বলিল, "আমি ফিরিয়া আসিয়াছি, আমাকে এবার গুলি করুন, আর দেরী করিবেন না।"

সেনাপতি বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "তুমি এত শীঘ্র আসিলে কেন? এখনও যে তোমার এক ঘণ্টা ছুটি ফুরায় নাই!" ভিক্টর বলিল, "মা কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, তিনি জাগিয়া উঠিলে আমার ফিরিয়া আসা কঠিন হইবে ভাবিয়া আমি আগেই চলিয়া আসিয়াছি।"

সেনাপতি আর আত্ম-সংবরণ করিতে পারিলেন না, তাঁহার চক্ষুদ্বয় সজল হইল। তিনি অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইলেন, পীড়িতা জননীকে প্রতিপালন করিবার মত অর্থ পাইবে ভরসা পাইয়াই ভিক্টর বিদ্রোহীদলে যোগ দিয়াছিল; সে যদি তাহাদের সহিত যোগ না দেয়, তবে তাহারা তাহাকে হত্যা করিবে বলিয়াও ভয় দেখাইয়াছিল। নতুবা প্রকৃত প্রস্তাবে ভিক্টরের কোন অপরাধ নাই।

তখন সেনাপতি আহ্লাদে ভিক্টরকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "সত্যবাদী সাহসী বালক! আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম! তুমি তোমার জননীর কাছে ফিরিয়া যাও! তুমি তাঁহাকে সর্ব্বদা ভালবাসিও। ঈশ্বর তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।"

"তবে তিনি জাগরিতা হইবার পূর্ব্বেই আমি তাঁহার নিকটে ফিরিয়া যাই!" এই বলিয়া ভিক্টর দয়ালু সেনাপতিকে কৃতজ্ঞ-চিত্তে অভিবাদন করিয়া দ্রুতপদে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

ভারতীয় পশু—(৩)

ইতিপূর্ব্বে * তোমাদিগকে বিড়াল, কুকুর ও ভালুকবংশের কথা কিছু বলিয়াছি ; আজ নকুলবংশের কিছু পরিচয় দিব। ইহাদের বংশে বাঘডাঁস, গন্ধগোকুল বা খাট্টাস, ভাম বা সড়েল, এবং নেউল বা বেজী, এই কয়েকটাই প্রধান। ইহাদের সকলের আকৃতি খুব ছোট হইয়া থাকে।

বঙ্গদেশ, আসাম, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর ও নেপাল প্রভৃতি স্থানে বাঘডাঁস দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের দেহের বর্ণ গাঢ় ধূসর, সর্ব্বাঙ্গে কাল কাল ডোরা আছে। ইহারা দিনে বনে জঙ্গলে লুকাইয়া থাকে, রাত্রিতে হাঁস, মুরগী, খরগোস, ইন্দুর ইত্যাদি শিকার করিয়া আহার করে। বাঘডাঁস গাছে চড়িতে পারে না ; কিন্তু ইহারা অত্যন্ত সন্তরণপটু। সচরাচর ইহারা একাকী থাকিতে ভালবাসে।

সিন্ধুপ্রদেশ, পঞ্জাব ও রাজপুতানা ভিন্ন ভারতবর্ষের সকল স্থানেই গন্ধগোকুল বা খাট্টাস দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদেরও রং ধূসর, তবে ডোরার পরিবর্ত্তে শরীরের পার্শ্বে সারি সারি কাল কাল চক্র আছে। লেজে আংটির মত সাদা ও কাল ডোরা আছে। ইহাদের লোম কর্কশ ও মোটা। ইহারা গর্ত্ত করিয়া বাস করে। ইহারা বেশ গাছে চড়িতে পারে। হাঁস

---

* সুনীতি-বিকাশ, প্রথম ভাগ, ৬৫— ৭৬ পৃষ্ঠা।

মুরগী প্রভৃতি ইহাদের প্রিয় খাদ্য। ইহাদিগকে শৈশবে ধরিয়া আনিলে ইহারা বেশ পোষ মানে এবং ইন্দুর মারিয়া গৃহস্থের উপকার করে।

সিন্ধু ও পঞ্জাব প্রদেশ ব্যতীত ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই ভাম বা সড়েল দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন স্থানের লোকেরা ইহাকে ভোঁদড় ও দিগ্ল্যাজ বা দীর্ঘলেজ বলিয়া থাকে। আবার অনেকেই বাঘচাঁস, খাট্টাস ও ভোঁদড়ের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করেন না। কিন্তু বাস্তবিক ইহারা একই প্রকারের জন্তু নহে।

ভামের গায়ের ধূসর বর্ণে অনেক অস্পষ্ট চক্র আছে, কিন্তু পৃষ্ঠদেশে ডোরা নাই। ইহাদের মুখের রং কাল, চক্ষুর উপরে ও নীচে এবং নাসিকার উভয় পার্শ্বে এক একটী সাদা বিন্দু আছে। ইহাদের শরীরটী বাইশ ইঞ্চি ও লেজটী আঠার ইঞ্চি লম্বা হয়। ইহাদের "দীর্ঘলেজ" নামটী বড় বৃথা নয়।

ভোঁদড় গাছে চড়িতে বিশেষ পটু, দিনের বেলায় গাছের ডালে বা কোটরে কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া থাকে। রাত্রিতে ছোট ছোট পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ও সুমিষ্ট ফলমূলাদি আহার করিয়া জীবন ধারণ করে।

ভারতবর্ষের প্রায় সকল দেশেই নকুল বা বেজী দেখিতে পাওয়া যায়। বেজি নানা প্রকারের—কোন কোনটা খুব ছোট, আবার কোন কোনটী বিড়ালের মত বড় হয়। ইহাদের গায়ের বর্ণও নানা স্থানে নানারূপ। তবে সাধারণতঃ আমরা তামাটে রংএর বেজি দেখিয়া থাকি। ইহাদের দেহের লোম

বড় বড় ও কর্কশ, লেজটী দীর্ঘ ও ঝাঁকড়া লোমে পরিপূর্ণ। চক্ষু গোলাকার ও রক্তবর্ণ। বাঘঢাঁস প্রভৃতির ন্যায় নকুলের শরীরে তীব্র দুর্গন্ধ নাই।

বেজি অতি সহজেই মানুষের পোষ মানে এবং ইঁদুর, সাপ ইত্যাদি শীকার করিয়া যথেষ্ট উপকার করে। বন্য বেজি অপেক্ষা পোষা বেজি বেশী সাহসী ও কৌতুকপ্রিয় হয়। বেজির বিষয়ে একটী সুন্দর গল্প আছে।

একজন দরিদ্র গৃহস্থের স্ত্রী তাঁহার নিদ্রিত শিশু-সন্তানের নিকটে স্বামীকে থাকিতে বলিয়া জল আনিবার জন্য পুষ্করিণীর ঘাটে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের বাড়ী হইতে পুষ্করিণীটী কিছু দূরে ছিল। এমন সময় হঠাৎ কোন বিশেষ প্রয়োজনে উক্ত দরিদ্র গৃহস্থকেও অল্পক্ষণের নিমিত্ত বাহিরে যাইতে হয়। তিনি ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার পোষা বেজিটী রক্তাক্ত দেহে গৃহ হইতে বাহিরে আসিতেছে। সে যে তাঁহার শিশু পুত্রের প্রাণনাশ করিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না। তখন তিনি শোকে উন্মত্ত হইয়া একটী চেলা কাষ্ঠ দ্বারা প্রচণ্ড বেগে বেজির মস্তকে আঘাত করিলেন, সে গতাসু হইয়া ধূলায় লুটাইল।

সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার স্ত্রী জলের কলসী লইয়া ফিরিয়া আসি-লেন। তিনি শোকার্ত্ত স্বামীর নিকটে বেজির কথা শুনিয়া জলের কলসী দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং আর্ত্তনাদ করিতে করিতে গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ক্ষুদ্র শিশুটীর তো কোন অনিষ্ট হয় নাই! তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া তাঁহাকে কোলে

তুলিয়া লইতে গিয়া দেখিতে পাইলেন, তাহার শিয়রের নিকটে একটী ভীষণ কেউটে সাপ খণ্ড বিখণ্ড হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তখন প্রকৃত ব্যাপার কি বুঝিতে পারিয়া তিনি স্বামীকে ডাকিয়া বলিলেন,—"বেজি তো খোকার কোন অনিষ্ট করে নাই! বরং সে সাপের হাত হইতে খোকাকে রক্ষাই করিয়াছে! সে খোকাকে বাঁচাইল, আর তুমি তাহার প্রাণ বধ করিলে!!" তারপর স্বামী স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া এমন উপকারী বেজির জন্য অনেক দুঃখ করিতে লাগিলেন।

সেই দিনই সেই দরিদ্র গৃহস্থ তাঁহার গৃহ-দ্বারের শীর্ষদেশে বড় বড় অক্ষরে এই কয়টী কথা লিখিয়া রাখিলেন ঃ—

"না বুঝিয়া না ভাবিয়া নিমেষের তরে,
অকস্মাৎ যেই জন কোন কাজ করে,
আমার মতন সে যে সারাটী জীবন,
করে অনুতাপ আর অশ্রু বিমোচন।"

(পদ্যাংশ)

প্রার্থনা।

তোমার ভুবনে ঘুচুক্ দীনতা,
হীনতা হউক দূর,—
দিকে দিকে দিকে আজিকে দেবতা,
উঠুক্ মিলন-সুর !
সকল দুখের সকল শোকের
হোক্ অবসান আজি জগতের,
ছুটুক্ লহরী আশা-হরষের
মধু-সুধা-পরিপূর !
দিকে দিকে দিকে আজিকে দেবতা,
উঠুক্ মিলন-সুর।

কোথায় তাপিত কোথায় তৃষিত
কোথায় কুটীর-হারা !
জুড়াক সকলে আজিকে হে পিতঃ,
লভিয়ে করুণা-ধারা !
কে মুদিছে আঁখি দিবা-বিভাবরী,
ঘুমাইছে কেবা অকারণে পড়ি'
অবশ পরাণে বাজুক বাঁশরী
জাগিয়ে উঠুক্ তারা !

জুড়াক্ সকলে আজিকে হে পিতঃ,
লভিয়ে করুণা-ধারা !

আজিকে ফুলের মোহন হাসিটী
পাখীর ললিত তান,—
কেবলি হে দেব, তোমার কথাটী
করুক্ জগতে দান !
উদার আকাশে, উদার বাতাসে,
কল-নাদিনীর পুলক-বিলাসে,
ভাসিয়া বেড়াক্ আকুল উচ্ছাসে
তোমারি মহিমা-গান !
সকলি হে দেব, তোমার কথাটী
করুক জগতে দান !

উষা-বন্দনা।

(ঋগ্বেদ অবলম্বনে)

ভারতের পুণ্যাকাশে স্বরগের দীপ্তি ভাসে
এষ উষা, আদিত্যজননি !
তোমার অর্চ্চনাতরে রহিয়াছে অর্ঘ্য ভ'রে
সুপ্তোত্থিত সুন্দর ধরণী।

অয়ি ঊষা স্বর্গসুতে ! প্রীতিফুল্ল জ্যোতিঃ সাথে,
হও হেথা আজি সুপ্রকাশ ;
দিনে দিনে আমা সবে প্রদান সৌভাগ্য ভবে,
অন্ধকার কর গো বিনাশ।

অয়ি পূত-শুভ্র-ভূষা সুনিত্য তরুণী ঊষা !
অয়ি সর্ব্বধনের ঈশ্বরি !
মৃতবৎ প্রাণীগণে কৃপাবিন্দু বিতরণে
এস নব সংজ্ঞা দান করি'।

দূর দিগন্তের পটে কি আনন্দবার্ত্তা রটে
অয়ি ঊষা, অয়ি স্বর্ণ-লতা !
প্রথম তরঙ্গ তার আজি প্রাণে সবাকার
পূর্ণ কর, আশীর্ব্বাণী যথা।

বর্ষার প্রবাহ সম রশ্মিধারা নিরুপম
পরিব্যাপ্ত করিছে সংসার ;
তারি সনে, হে সুভগে ! দাও সবে অনুরাগে
শৌর্য্য বীর্য্য হৃদয়ে অপার।

সুকণ্ঠ বিহঙ্গদলে স্তুতি করে কুতূহলে,
মৃদুমন্দ বহে স্নিগ্ধ বায় ;—
প্রফুল্ল প্রসূন হাসে মধুপ গুঞ্জরি আসে,
কর হর্ষ শাশ্বত ধরায়।

কল্যাণী গৃহিণী যথা হয়ে অগ্রে জাগরিতা
গৃহজনে দেন জাগাইয়া,
তেমতি হে উষা সতি ! দাও আজি দ্রুতগতি
জড় সুপ্তি সবার নাশিয়া।

বিপর্য্যয় ত্রিভুবন ; তুমি সত্য সনাতন,
অয়ি উষা, অয়ি দিবাঙ্গনা !
যুক্তকরে ঊর্দ্ধমুখে ভক্তি-উচ্ছ্বসিত বুকে
করি আমি তোমার বন্দনা।

মাতৃ-স্নেহ।

(১)

মানবী কি দেবী বুঝিনি এখনো
স্নেহময়ী মা আমার ;
হেন অকৃত্রিম মধুর মমতা
কে করে জগতে আর ?
মোর সুখে দুখে তিনি সুখী দুখী
আপন ভাবনা নাই,—
জননী আমার দেবী কি মানবী
বুঝিনিকো আজো তাই !

(২)

কর্ত্তব্যের হায় কঠোর তাড়নে
যেখানেই রহি পড়ি',
স্নিগ্ধ মনোরম মুখচ্ছবি তাঁর
সতত হৃদয়ে ধরি।
যবে দুখ আসে, মা'র মধু নামে
ডাকিয়া সান্ত্বনা পাই,—
জননী আমার দেবী কি মানবী
বুঝিনিকো আজো তাই!

(৩)

ভব-প্রতিঘাতে যবে ভেঙ্গে পড়ি
দারুণ বেদনা পেয়ে,
নিরাশ-তিমিরে শকতি হারায়ে
বেড়াই আকুল হয়ে,
দরশনে মা'র ব্যথা হয় দূর
নব বল যেন পাই,—
জননী আমার দেবী কি মানবী
বুঝিনিকো আজো তাই!

(৪)

মা'র কাছে গেলে পুনঃ শিশু হই
আপনা রহেনা মনে,
মাতৃ-হীন মত হতভাগ্য আর
কেবা আছে ত্রিভুবনে?

মা'র স্নেহ-ক্রোড় অমৃতের খনি
বিষাদ-ভাবনা নাই,—
জননী আমার দেবী কি মানবী
বুঝিনিকো আজো তাই!

পণ।

এস আজি করি মোরা পণ!—
মোরা ফুলের মতন কোমল শোভন
বিমলচরিত হব!
মোরা রবির মতন জ্ঞানের কিরণে
ভুবন উজলি' রব!
মোরা নদীর মতন সাধি' পর-হিত
নীরবে বহিয়া যাব!
মোরা পাখীর মতন মাতায়ে সবায়
উদার রাগিণী গাব!
লয়ে উষার মতন নবীন চেতনা
দাঁড়াব জগত-দ্বারে;—
সবার দুঃখ, যাতনা, দৈন্য, ভাবনা,
তপ্ত নয়নাসারে
করিব নিয়ত বিমোচন,
এস মোরা করি এই পণ!

উষায় ধরণী।

আজি মা তোমায় কি বেশে নেহারি
　　উষার কোলে,—
হৃদয় আমার বেদনা পাশরি'
　　আপনা ভোলে !
নব বারিধারা গভীর নিশিতে
পা দু'খানি তোর ধোয়ায়ে চকিতে
　　থামিয়া গেছে,—
নিরমল মাগো, এবে চারি ধার,
একখানি যেন স্বপন মায়ার
　　ঘুমায়ে আছে !

মাধবীর শশী ডুবিছে গগনে
　　দীপ্তি-হারা,—
চাহিয়া রয়েছে করুণ নয়নে
　　হাজার তারা !
জ্যোছনা-বালিকা কি সুখে কে জানে
খেলিয়া বেড়ায় মা তোর বিতানে
　　আপন মনে,—
শুনাইতে তোরে জাগরণী-গীতা
শুকতারা মাগো, পূবে জাগরিতা
　　এ শুভক্ষণে !

মা তোর আঁচল দোলায়ে সমীর
বহিছে ধীরে,—
তরুলতাকুল ভাসিছে গভীর
পুলক নীরে!
তোর মা অলক-সুবাস লুটিয়া
বনে বনে কলি উঠিছে ফুটিয়া
পূজিতে তোরে,—
সজাগ বিহগ কুলায় কুলায়
রহি' রহি' তোর গুণ-গীতি গায়
মধুর স্বরে!

গোধূলি।

সন্ধ্যাভাগে অরুণিম পশ্চিম গগন,
পৃথিবী, আকাশতল প্রসন্ন সুন্দর;
গৃহপানে ছুটিয়াছে গাভী অগণন
ক্ষুরাঘাতে উড়াইয়ে ধূলি গাঢ়তর।

বনদেবী রচে অর্ঘ্য চারু পুষ্পদলে,
কনক-প্রদীপ ধীরে জ্বালে সুরাঙ্গনা;
শীতল সমীর-স্পর্শ প্রতি পলে পলে
জাগায় অবশ হৃদে আনন্দ কত না!

বিহঙ্গেরা ফিরিতেছে আপন কুলায়
মুখরি' অম্বর-পথ বিদায়ের গানে,
রাত্রির ধূসর বাস দিগন্ত-সীমায়
দেখা যায় যেন দূরে ত্রিদিব-বিতানে!

কি মৌন নিবিড় শান্তি ধরণীর বুকে—
প্রাণ মোর মগ্ন হতে চাহিতেছে সুখে!

গান্ধারী।

১

মঙ্গল উৎসবমাঝে মন্থরগমনে
দিল দেখা হিরণ্ময় রথ,
ধ্বনিল অযুত শঙ্খ গভীর স্বননে,
পুষ্প মাল্যে আবরিল পথ;
বিস্ময়ে আনন্দে রাজদম্পতীর পানে
নিরখিল লক্ষ নরনারী,
বসে আছে অন্ধ নৃপ ধৃতরাষ্ট্রবামে
বদ্ধনেত্রা নবোঢ়া গান্ধারী!

২

সজ্জিত বিশাল চমূ, ধ্বনি' দশ দিশ
বাজিতেছে সমর বাজনা,
মহারাজ দুর্য্যোধন বিজয়-আশীস্
মাতৃপদে করিল যাচনা !
ভাবী অমঙ্গল ভয়ে ঝঞ্ঝা উঠে বুকে,—
ত্রস্তে মুছি নয়নের বারি,
'যথা ধর্ম্ম তথা জয়' ধীরে ম্লান মুখে
কহিলেন জননী গান্ধারী !

৩

পুণ্য-ভূমি কুরুক্ষেত্রে ক্রন্দন-কল্লোল
উঠিতেছে রণ অবসানে,
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী স্থির অচঞ্চল
বীরারাধ্য সুখদ শয়নে !
প্রশান্তহৃদয়ে বসি শত-পুত্র-হারা
সন্তান-শিয়রে আপনারি—
প্রাণপাখী মুক্ত যেন ত্যজি দেহ-কারা
মহাভাবে বিহ্বলা গান্ধারী !

৪

সুশোভিত 'দ্বৈপায়ন' শ্যাম অরণ্যানী
পশ্চিম পারশে জাহ্নবীর ;
মুখর বিহগবৃন্দ হরে দুঃখগ্লানি,
বহে সদা মৃদুল সমীর ;

ত্যজি সুখ রাজ-ভোগ কুটীর প্রাঙ্গনে
কৃষ্ণাজিন-আসন বিস্তারি'
পতিসাথে আমরণ যুক্ত কায়মনে
ধ্যানমগ্না তাপসী গান্ধারী !

ধর্ম্মার্থে নিহত ঈশা।

১

কেন জনাকীর্ণ নগরের পথ,
কিসের কারণে কোলাহল অত ?
দুর্ভেদ্য য়িহুদা-সৈনিকের দল
কাহারে ঘেরিয়া করে কোলাহল ?
—ওই যে, ঈশার নিরমল দেহ
ধূলি-ধূসরিত, লাঞ্ছিত, নিঃস্নেহ,
ছিন্ন বাস, আহা ! ম্লান দীন বেশ,
বিদারিত কায়, যন্ত্রণা অশেষ !

২

"লও লও ক্রুশ—তোল, তোল, তোল"—
উঠিল আবার উচ্চ কোলাহল।
নিদারুণ সবে উন্মত্তের প্রায়
অমনি ঘেরিয়া ধরিল ঈশায়।

—কোথা যাস্ তোরা, কিসের কারণ ?—
"বধিব মোদের বঞ্চক রাজন্ !"
মহা কোলাহলে দিগন্ত ব্যাপিল,
শত্রুদল ঘন ঘন গরজিল।
স্বর্গীয় আলোকে এহেন সময়
ঈশার আনন তবু জ্যোতির্ম্ময়।
স্কন্ধে ক্রুশ, শিরে মুকুট কাঁটার,
বিক্ষত ললাটে শোণিতের ধার,
ঊর্দ্ধে নেত্রদ্বয়, গম্ভীর মূরতি,
নির্ভীক অন্তর, অচঞ্চল মতি।

৩

"তোল ক্রুশ তোল, সম্মুখে 'কেল্‌ভেরা'"
মত্ত সৈনিকেরা আস্ফালন করি'
উঠিল গর্জ্জিয়া হয়ে অগ্রসর
ধরিয়া ঈশার নিরমল কর।
রাজপথ পূর্ণ বহু জনতায়,
নর, নারী, শিশু বেড়িয়া তাঁহায়,
কাঁদিছে চৌদিকে অসংখ্য রমণী,
মিলিত তা'সনে শিশু-কণ্ঠধ্বনি।
আহা! কি অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ব্যাপার
ধর্ম্মার্থে নিহত জীবন ঈশার।

৪

কেন লোকারণ্য 'কেল্‌ভেরী' গিরি ?—
"তোল ক্রুশ তোল সবে জোর করি,
লও দৃঢ় রজ্জু ঈশারে বাঁধিতে,
ধর, টান, তোল ধরণী হইতে !"—
দুরন্ত সেনানী মহা কোলাহলে
গর্জ্জিল আনন্দে মাতিয়া সকলে।
হস্তপদদ্বয় মহাত্মা ঈশার
লৌহ-শলাকায় বিঁধিল আবার।
বিশ্বাসের জয় ঘোষিয়া ভুবনে
দাঁড়াইল ক্রুশ আকাশের পানে।
স্বর্গীয় আলোকে এহেন সময়
ওই দেব-মূর্ত্তি তবু জ্যোতির্ম্ময়।
অত কোলাহলে, অত জনতায়
অভ্র-ভেদী ধ্বনি ওকি শোনা যায়—
"ক্ষমা কর পিতা, এরা যে অবোধ,
কি কাজ করিল—নাহি কিছু বোধ !
লও পিতা মোরে, করি আত্ম-দান,
হউক তোমাতে এ মহাপ্রয়াণ।"

প্রকৃত মনুষ্য।

আলস্যে করিয়া নষ্ট অমূল্য সময়
যে মূর্খ নিদ্রিত সদা আপনারে ছলি ;—
হোক্ না সে সুস্থকায় সৌন্দর্য্যনিলয়,
কে তারে মনুষ্য বলে ?—আমি নাহি বলি !

অসার আনন্দ যার জীবনের ব্রত,
নিমগ্ন নিরয়-পঙ্কে পবিত্রতা দলি ;—
হোক্ না সে বুদ্ধিমান্ ধনবান্ শত,
কে তারে মনুষ্য বলে ?—আমি নাহি বলি !

যে অন্ধ উন্মত্ত গর্ব্বে, করে সদা ধ্যান
পর-চর্চ্চা, পর-দ্বেষ, স্বার্থে শুধু জ্বলি ;—
হোক্ না সে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত মহান্,
কে তারে মনুষ্য বলে ?—আমি নাহি বলি !

সরল, পবিত্র, কর্ম্মী, নির্ম্মল, উদার,
প্রকৃত মনুষ্য সেই, সম্পদ ধরার।

কথা ও কাজ।

কথা ত ফুলের মত দু'দিনে শুকায়—
ফুরায় তাহার বাস—বাহ্য আড়ম্বর ;
মৃগনাভি সম কাজ যুগ-যুগ যায়
আমোদিত করে তায় বিশ্বচরাচর।
কথা হ'তে কাজ আমি ভালবাসি তাই
যে টুকু শকতি আছে কাজ করে যাই।

নব বর্ষ।

এস এস নববর্ষ, লয়ে শুভাশীস হর্ষ
এ বিশাল বসুন্ধরা তরে,
বিমল পরশে তব, পবিত্র হউক সব
মলিনতা যাক ক্ষণে সরে।

নবীন উদ্যম আশে নিরাশা-জলদ-পাশে
নাশি কর বিশ্ব জ্যোতিস্ময়,
ভব-মোহে মৃতপ্রায় বৃথা যার কাল যায়
দাও তারে চেতনা অভয়।

মন্দ যদি কিছু রয়, তাও আজি কর লয়,
চিরগত বরষের সনে ;
সুকাজে রাখিয়া মতি, সুপথে গো দ্রুতগতি
লয়ে যাও সবে প্রতিক্ষণে।

নবীন চেতনা দানে, নবীন সঙ্কল্প প্রাণে
জাগাও আজিকে আরবার ;
দেবকার্য্যে হয়ে রত এ জীবন হোক গত,
কিছু নাহি চাহি কভু আর।

শরৎ-মাধুরী।

থামিল বরষা-ধারা,
প্রকৃতি পাগল-পারা,
শরতের আগমনী অবনীতে ঘোষিল
ফুরাল ভেকের গান,
বিজুলির(ও) অবসান,
নভোদেশ মেঘ-হীন নিরমল হইল ॥
সুনীল গগন 'পরে,
আবার বিমল করে,
আলো করি' দিবানিশি রবি-শশী উদিল।

বিকচ স্বরগ-ফুল,
কনক তারকাকুল,
থরে থরে নিশাকালে আরবার ফুটিল ॥
পল্লবিত তরুলতা
মর্ম্মরিল হেথা হোথা
তরুশাখা ফুলে ফলে অবনত হইল।
মধুকর দলে দলে,
মধু-লোভে কুতূহলে,
গুণ গুণ গুঞ্জরিয়া দিশা-হারা ছুটিল ॥
পুলকে বিহগ যত,
কল-তানে অবিরত,
ধরা-বুকে সুমধুর সুধা-ধারা ঢালিল।
ফুলের সুবাস মেখে,
মনঃ-সুখে থেকে থেকে,
মৃদুল শীতল বায় আরবার বহিল ॥
যতেক সরসী দল,
জলভরা টলমল,
সু-ধীরে লহর-মালা বায়ুভরে মাতিল।
চাষীর যতনে কত,
মাঠে মাঠে শত শত,
সবুজ ধানের গাছ মাথা তুলি চাহিল ॥
শ্যামল তৃণের দল,
মনে হয় মখমল,

কেবা যেন বসিবারে ভূমিতলে পাতিল।
কার তরে মরি! মরি!
সুচারু বসন পরি'
হরষেতে ধরা-রাণী শরতেতে সাজিল॥
কাহার মাধুরী-কণা
লভি ধরা সুশোভনা,
শরতের পরশনে আজি হেন হইল।
শরৎ-মাধুরী মাঝে,
নমি সে মাধুরী-রাজে,
যে জন মাধুরীভরা এ শরৎ রচিল॥

করুণাময়।

জানি আমি দয়াময় রচিলা ভুবন,
এত হাসি, এত গান, এত শোভাভরা;
তাঁহারি করুণা-গড়া চাঁদিমা তপন
দিবানিশি আলোকিত করিতেছে ধরা।

তাঁহারি রচিত কত উচ্চ মহীধর,
তাঁহারি রচিত কত সমুদ্র অতল;
ছোট বড় কত নদী বহে তর তর,
কত শত দেশ করি সরস শীতল!

তাঁহারি সৃজিত কত বিহঙ্গমদল
সারা দিন গায় বসি এত মধু গান ;
তাঁ'রি করুণায় ফুটে কুসুম অমল
অতুল শোভায় হরি' সবার পরাণ !

সুখদ সমীর বহে তাঁহারি দয়ায়,
তাঁহারি দয়ার কথা কহি জনে জনে,
পিতামাতা, ভাইবোন, স্বজন সখায়,
তাঁ'রি করুণায় মোরা পেয়েছি ভুবনে।

যখন যে দিকে কেন রাখিনা নয়ন
হেরি তাঁর দয়া ছাড়া কিছু হেথা নাই,
তোমার-আমার এই শরীর-জীবন
তাঁ'রি মহা করুণায় বিরচিত, ভাই !

যিনি এত দয়াময়—এতই মহান্—
ছোট বলে মোদের কি ভুলেছেন তিনি ?—
কেমনে তাঁহারে ভুলি করিব পয়াণ—
তাঁহারি পূজায় এস লই তাঁরে চিনি !

বিশ্ব-রূপ।

তুমি কি দয়াল হরি, তপনের সাথে
আস নিতি উজলিতে মোর ছোট ঘর ;—
শশী তারা সুধা ঢালে সুনীরব রাতে,
তুমি কি লুকায়ে রহ তাহারি ভিতর ?

ফুলের হাসির মাঝে তব হাসিখানি
আমার বাগান ভরি' প্রতিদিন ফুটে ;—
লহরে, পাখীর তানে, মনে মনে মানি
তোমারি মধুর গীতি অবিরাম ছুটে !

মৃদু বায়ে মাখা কিবা তব পরশন
দীননাথ, ভুলাইতে যাতনা আমার ;—
পিতামাতা, ভাইবোন, সখাসখীগণ,
তোমারি কি ভালবাসা বহে অনিবার !

যেদিকে যখন হেরি, নিরখি তোমায়—
কত রূপে তুমি দেব, রাজ এ ধরায় !

চির-জাগ্রত।

যখন ঘুমায় ধরা গভীর নিশায়
তখনো একেলা বসি সবার শিয়রে
তুমি প্রভু, জাগি রহ কত করুণায়—
না ভুলি কাহারো কথা তিলেকের তরে !

সুখে দুখে, রোগে শোকে, আলোকে আঁধারে,
আঁখির আড়াল তব কেহ নাহি হয় ;—
কেহ কোনও কাজ কিগো পারে সাধিবারে
তোমার অজ্ঞাতে কভু, সর্ব্বজ্ঞানময় ?

নয়নে তোমার কভু নাহিক নিমেষ ;
সজাগ-নয়ন তব সবার উপরে ;
দৃষ্টি তব মরমের সুগোপন দেশ
সতত যে অনায়াসে প্রবেশিতে পারে।

মনে কি বচনে মোরা কোন পাপ তাই
ভুলেও করিতে কভু বড় ভয় পাই !

নিবেদন।

বিশাল জগতে তব কত ক্ষুদ্র আমি
আছে তবু মোর কত কাজ ;
শক্তি দাও সারা বুকে চির-দিন-যামি
সাধিতে তা রাজ-অধিরাজ !

তুচ্ছ ধূলিকণাটীও রাখে সে গৌরব
তা'রো প্রভু, আছে প্রয়োজন,—
বঞ্চিত কি হবে দাস চরণ-বৈভব
বিফল কি হবে এ জীবন ?

অনন্ত আকাশ-কোলে ক্ষুদ্র বিহঙ্গম
কি আনন্দে গান গেয়ে যায়,—
তেমতি মহিমা তব ওগো প্রিয়তম,
প্রকাশিতে প্রাণ শুধু চায় !

বুদ্বুদ্-হৃদয়ে ঝলে সহস্রকিরণ
বারি-বিন্দু মিশে সে সাগরে,—
এ অধম মাগে জ্যোতিঃ তাহার মতন
রাখে আশা তেমতি অন্তরে !

ঈশ-প্রেম।

ওগো প্রেমময়! করুণা তোমার
পলে পলে মোর অনুভবে প্রাণ;
রহি অন্তরালে কত ভালবাস
ভেবে ভেবে আমি হই হতজ্ঞান।

সারা বিশ্ব ভরি রেখেছ সাজায়ে
সুখতরে আহা কত কি যতনে,
যে দিকে নিরখি তোমার মহিমা
কেবলি আমার পড়ে যে নয়নে।

ঊষাকালে জাগি সুধাভরা সুরে
তব যশ করে বিহগ ঘোষণা,
কুসুম সুবাসে আমোদে গো দিক
সমীর প্রকাশে তোমার করুণা।

লোহিত বরণে রঞ্জি নভঃস্থল
দিনমণি দিয়ে ধীরে দরশন,
জড়তা বিনাশি নানা উপকারে
প্রকাশে তোমার স্নেহ অতুলন।

বায়ু, শস্য, জল, ফুল, ফল আদি
রেখেছে বাঁচায়ে তব করুণায়;
সম স্নেহ-দৃষ্টি সব প্রতি তব
উত্তমে অধমে সম স্নেহ পায়।

সদা সাথে রহি নীরব আহ্বানে
নিতে তুমি চাও শুভ পথপানে,
অবোধ হৃদয়, সেই আবাহন
তাই ত পশেও পশেনাক কাণে।

তুমি চাও বুকে রাখিতে জড়ায়ে
উপেক্ষি সে স্নেহ বুঝেনা তোমায়,
তব ভালবাসা অসীম অপার
প্রকাশিতে নারে কেহ তুলনায়।

ওগো প্রেমময়! তোমার করুণা
রাখিব হৃদয়ে করি কণ্ঠহার;
তব নাম চির জীবনে মরণে
মহাবল এই বিশ্বে সবাকার।

বঙ্গের খ্যাতনামা কবি

শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত

কাব্য গ্রন্থাবলী।

১। ধ্যান-লোক। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বেদান্তরত্ন, এম, এ, বি, এল, পি, আর এস, মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা সংবলিত ও কবির চিত্র পরিশোভিত। মূল্য বারো আনা।

২। তপোবন। মহাকবি নবীনচন্দ্র সেন মহোদয়ের অমর স্মৃতিতে উৎসর্গিত। মূল্য বারো আনা।

৩। অঞ্জলি। কবিগুণাকর নবীনচন্দ্র দাস, এম-এ, বি-এল, মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা সংবলিত। মূল্য আট আনা।

৪। প্রহ্লাদ-উপাখ্যান। টেক্সটবুক কমিটী কর্ত্তৃক পারিতোষিক পুস্তক রূপে নির্দ্ধারিত। সচিত্র; সুন্দর রেশমের বাঁধাই। মূল্য পাঁচ আনা।

শিশু ধ্রুবের সাধনোপাখ্যান।

বালকবালিকাদের উপযোগী পুণ্যকাহিনী। মূল্য দুই আনা।

মহিলা কবি শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্ত প্রণীত

কাব্য গ্রন্থাবলী।

১। শিশির। মূল্য চারি আনা। ২। মাধবী। মূল্য এক টাকা।

এই সকল পুস্তক বঙ্গের যাবতীয় মনীষি সমাজে এবং প্রবাসী, ভারতী, নব্যভারত, বঙ্গবাসী, সঞ্জীবনী, বেঙ্গলী, অমৃতবাজার প্রভৃতি বহুতর দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকায় অতি উচ্চরূপে প্রশংসিত ও সমালোচিত। কলিকাতার প্রসিদ্ধ পুস্তকালয় সমূহে এবং নিম্ন ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

শ্রীস্বর্ণকুমার দত্ত

সাধনাকুঞ্জ, ঘাটফরাদ বেগ, চট্টগ্রাম।